কুরআন বুঝা সহজ

অধ্যাপক গোলাম আযম

কুরআন বুঝা সহজ
(বর্ধিত সংস্করণ)

অধ্যাপক গোলাম আযম

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

কুরআন বুঝা সহজ

কুরআন পাক মানব জাতির সঠিক হেদায়াতের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে পাঠানো হয়েছে। তাই এর নাম হলো কিতাবুল্লাহ বা আল্লাহর কিতাব। এ কিতাব শেষ নবী ও শ্রেষ্ঠতম রাসূল হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে অহী যোগে নাযিল করা হয়েছে। এ কিতাব শুদ্ধভাবে পড়ে শুনানো এবং এর সঠিক অর্থ বুঝিয়ে দেয়ার দায়িত্বও রাসূলের উপরই দেয়া হয়েছিল।

আল্লাহ তায়ালা এ কিতাবের রচয়িতা এবং রাসূল (সাঃ)-এর ব্যাখ্যাদাতা। মানব জাতির পার্থিব শান্তি ও পরকালীন মুক্তি এ কিতাবের শিক্ষার উপরই নির্ভরশীল। তাই এ কিতাব সব মানুষের পক্ষেই বুঝতে পারা সম্ভব। অবশ্য সবাই এ থেকে উপদেশ গ্রহণ করার যোগ্য না-ও হতে পারে। আল্লাহ পাক কুরআন সম্পর্কে বলেছেন,

"এটা মানুষের জন্য এক বিবৃতি এবং মুত্তাকিদের জন্য হেদায়াত ও উপদেশ।"–আলে ইমরান ঃ ১৩৮

কুরআন থেকে হেদায়াত পাওয়ার জন্য কুরআনকে বুঝতে পারাই হলো পয়লা শর্ত। বুঝবার সাথে সাথে তাকওয়ার শর্তও থাকতে হবে। কুরআন যা মানতে বলে তা মানতে রাজী হওয়া এবং যা ছাড়তে বলে তা ছাড়তে প্রস্তুত থাকাই হলো তাকওয়া। কিন্তু যে কুরআন বুঝে না সে কি করে তাকওয়ার পথে চলবে ? তাই সবাইকেই পয়লা কুরআন বুঝতে হবে।

অবশ্য কুরআন বুঝবার মান সবার এক হতে পারে না। যার যার যোগ্যতা অনুযায়ী মান ভিন্ন ভিন্ন হবেই। আল্লাহ পাক কারো কাছ থেকেই তার যোগ্যতার অতিরিক্ত দাবী করেন না। কিন্তু দুনিয়ার জীবনে প্রত্যেককেই যে সব দায়িত্ব পালন করতে হয় তা কুরআনের শিক্ষা অনুযায়ী হতে হবে। যারা পড়তে জানে না তারা কুরআনের শিক্ষায় শিক্ষিতদের কাছ থেকে জেনে নিয়ে তাদের দায়িত্ব পালন করবে।

কিন্তু যারা পার্থিব জীবনের সামান্য ৫০/৬০ বছরের মধ্যে ২০/৩০ বছর শুধু রুজি রোজগারের জন্যই বিভিন্ন শিক্ষায় খরচ করে, তারা যদি কুরআনকে ভালভাবে বুঝবার চেষ্টা না করে তাহলে আখিরাতে আল্লাহর কাছে কী কৈফিয়ৎ দেবে ? দুনিয়াতে এত বিদ্যা শিখেও কুরআন সম্পর্কে জাহেল থাকা সত্যিই চরম লজ্জার বিষয়।

যারা কিছু লেখাপড়া জানে তাদের পক্ষে কুরআন বুঝা সম্ভব এবং একটু মনোযোগ দিলে এটা সহজও বটে। আরবী ভাষা যারা মোটামুটি বুঝে তারা কুরআন বুঝতে যে বেশী তৃপ্তি বোধ করে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু

কুরআন বুঝবার জন্য আরবী জানা শর্ত নয়। অন্যকে কুরআন বুঝাতে হলে আরবী অবশ্যই জানতে হবে। কিন্তু আরবী না জানলেও কুরআনের বক্তব্য বুঝা সম্ভব।

যারা আরবী না জানা সত্ত্বেও কুরআন বুঝবার চেষ্টা করতে চান তাদের জন্য এ পুস্তিকায় 'সিনপসিস্' (সংক্ষিপ্ত ইংগিত) আকারে প্রয়োজনীয় গাইড লাইন দেবার চেষ্টা করেছি। আরবী ভাষা জানা লোকদের জন্যও এ পুস্তিকাটি সহায়ক হবে বলে আমার বিশ্বাস। এ পুস্তিকার মূল চিন্তাধারা এ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তানায়ক সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর (রঃ) "তাফহীমুল কুরআন" নামক বিশ্ব বিখ্যাত তাফসীরের ভূমিকা থেকে নিয়েছি। এ তাফসীরে সূরা সমূহের ভূমিকায় কুরআন বুঝাবার যে 'গাইড লাইন' পেয়েছি তা থেকে অনেক কথা এখানে উল্লেখ করেছি। তাছাড়া এ পুস্তিকায় আরও কিছু তথ্য আছে যা বিভিন্ন বই থেকে সংগ্রহ করেছি।

মগবাজারস্থ কাজী অফিস লেন মসজিদে 'কুরআন বুঝবার সহজ উপায়' সম্পর্কে ১৯৭৯ সালে একটানা কয়েকমাস সাপ্তাহিক আলোচনা চলে। ঐ বৈঠকে অংশগ্রহণকারীদের জন্য 'সিনপসিস্' আকারে যে নোট দিয়েছিলাম তা ১৯৮০ সালে 'শতাব্দী প্রকাশনী' পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করে এবং এর উপকারিতা প্রমাণ করে। সে পুস্তিকাটি মাত্র ১৪ পৃষ্ঠা ছিল।

১৯৮১ ও ৮২ সালে কুরআন স্টাডী সার্কেলের মাধ্যমে আল্লাহর কিতাবকে বুঝবার জন্য আমার সহকর্মী কিছু লোককে নিয়ে যেটুকু চেষ্টা করেছি তাতে আমার বিশ্বাস সৃষ্টি হয়েছে যে যারা মোটামুটি কিছু লেখাপড়া জানেন তারা চেষ্টা করলে কুরআন বুঝতে পারবেন। তাই উপরোক্ত 'সিনপসিস্' কে ভিত্তি করে প্রয়োজনীয় অনেক কথা শামিল করে বর্ধিত আকারে নতুন নামে এ বইটি প্রকাশ করা হচ্ছে।

পঞ্চম সংস্করণে 'কুরআনের' আন্দোলনমুখী তাফসীর, 'আন্দোলনের দৃষ্টিতে অধ্যয়ন' ও 'নবী কাহিনীর উদ্দেশ্য'–এ তিনটি নতুন পরিচ্ছেদ যোগ করা হয়েছে।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে সত্যি কুরআন বুঝা সহজ। বুঝবার টেকনিক না জানলে সহজ বিষয়ও কঠিন মনে হয়। কিন্তু সঠিক কায়দা কানুন জানলে কঠিন কাজও সহজ হয়। আল্লাহ পাক এ পুস্তিকাটিকে কুরআন অধ্যয়নে আগ্রহীদের জন্য সহায়ক হিসাবে কবুল করুনন্থ—এ দোয়াই করছি।

রজব-১৪০৯	**গোলাম আযম**
ফেব্রুয়ারী-১৯৮৯	মগবাজার, ঢাকা।
ফাল্গুন-১৩৯৫	

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
১-৩. কুরআন ও রাসূলের দায়িত্ব	৭-৮
৪. কুরআনের আন্দোলনমুখী তাফসীর	৯
৫. গোটা কুরআনের পটভূমি	১১
৬. সমাজ বিপ্লবের উপযোগী আন্দোলনের পরিচয়	১৪
৭. রাসূল (সাঃ)-এর আন্দোলনের বিভিন্ন যুগ ও স্তর	১৫
৮. মাদানী যুগের ঘটনা	১৬
৯. মাক্কী সূরার বৈশিষ্ট্য	১৭
১০. মাদানী সূরার বৈশিষ্ট্য	১৭
১১. কুরআনের অন্যান্য বৈশিষ্ট্য	১৮
১২. মাক্কী ও মাদানী সূরার সংখ্যা	১৯
১৩. মাক্কী সূরার তালিকা	২০
১৪. মাদানী সূরার তালিকা	২৩
১৫. মাক্কী সূরার শ্রেণীবিন্যাস	২৪
১৬. সূরার সংখ্যা ভিত্তিক হিসাব	২৯
১৭. কুরআনের আলোচ্য বিষয়	৩০
১৮. কুরআনের আলোচনা কৌশল	৩৪
১৯. আন্দোলনের দৃষ্টিতে অধ্যয়ন	৪০
২০. অধ্যয়নের টেকনিক	৪১
২১. নবী কাহিনীর উদ্দেশ্য	৪২
২২. কুরআনের শিক্ষা ব্যাপক করার উপায়	৪৩
২৩. দারসে কুরআনের পদ্ধতি	৪৫
২৪. কুরআনের মর্মার্থ ধরা	৪৬
২৫. মোট আয়াত, শব্দ ও অক্ষর	৪৭

بسم الله الرحمن الرحيم

১. কুরআন ও অন্যান্য কিতাবের মধ্যে পার্থক্য

ক. কুরআন প্রচলিত বই এর মত এক সাথে লিখিত আকারে পাঠানো হয়নি। ২৩ বছরে ইসলামী আন্দোলনের বিভিন্ন অবস্থাকে সামনে রেখে কিছু কিছু করে বক্তৃতার আকারে নাযিল হয়েছে।

খ. গোটা কুরআনের বিষয় ভিত্তিক কোন নাম নেই। এর সব কয়টি নামই গুণবাচক। যেমন ঃ কুরআন (যা পাঠ করা হয়, যা পড়া কর্তব্য)। ফুরকান (যা হক ও বাতিলের পার্থক্য দেখিয়ে দেয়)। নূর (যা সঠিক জ্ঞান অর্জনের যোগ্য আলো দান করে)। যিকর (যা নির্ভুল উপদেশ দান করে, যা ভুলে যাওয়া শিক্ষা মনে করিয়ে দেয়)। আল-কিতাব (একমাত্র কিতাব যা 'লাওহি মাহফুযে' হিফাযত করা আছে)।

গ. ১১৪টি সূরার মধ্যে ৯টি সূরা ছাড়া ১০৫টি সূরার বিষয় ভিত্তিক নাম নেই। শুধু পরিচয়ের জন্য বিভিন্ন নাম দেয়া হয়েছে। সূরার কোন একটি শব্দ বা অক্ষর থেকেই নামকরণ করা হয়েছে।

ঘ. নিম্নের নয়টি সূরার নাম ও আলোচ্য বিষয় এক ঃ

১. ৫৫নং সূরা–আর রাহমান

২. ৬৩নং সূরা–আল মুনাফেকুন

৩. ৬৫নং সূরা–আত তালাক

৪. ৭১নং সূরা–নূহ

৫. ৭২নং সূরা–জ্বিন

৬. ৭৫নং সূরা–আল কিয়ামাহ্

৭. ৯৭নং সূরা–আল কাদর

৮. ১০১নং সূরা–আল কারিয়াহ

৯. ১১২নং সূরা–আল ইখলাস

শেষ সূরাটির নাম সূরার মধ্যে নেই। এ নামটি গুণবাচক। অন্যান্য সূরার নাম যে শব্দে রাখা হয়েছে তা সূরা থেকেই নেয়া হয়েছে।

ঙ. কুরআনের ভাষা সাধারণত টেলিগ্রামের মত সংক্ষিপ্ত। যিনি পাঠিয়েছেন তিনিই এর সঠিক অর্থ জানেন। যার কাছে পাঠানো হয়েছে তাঁকেই সঠিক অর্থ বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। তাই তাঁর শেখান অর্থই একমাত্র নির্ভরযোগ্য।

২. কুরআন যার উপর নাযিল হয়েছে তাঁকে যে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল ঃ

ক. মানব জাতিকে আল্লাহর রচিত বিধান অনুযায়ী জীবন যাপনের বাস্তব শিক্ষা দান করাই তাঁর দায়িত্ব ছিল।

খ. সে দায়িত্ব পালনে সাহায্য করা ও তাঁকে ঠিকমত পরিচালনা করার প্রয়োজনে যখন যেটুকু দরকার সে পরিমাণ আয়াতই নাযিল হয়েছে।

গ. সে দায়িত্বের দরুন স্বাভাবিকভাবেই তিনি একজন বিপ্লবী নেতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হন।

ঘ. প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা উৎখাত করে নতুনভাবে সমাজকে গড়ে তুলবার উদ্দেশ্যে তাঁকে সমাজ বিপ্লবের উপযোগী আন্দোলন পরিচালনা করতে হয়।

ঙ. এ ধরনের আন্দোলন প্রতিষ্ঠিত সমাজ ব্যবস্থার সাথে অনিবার্য রূপেই সংঘর্ষের জন্ম দেয়।

৩. এ আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন করে কুরআন বুঝা কিছুতেই সম্ভব নয় ঃ

ক. ২৩ বছরের দীর্ঘ আন্দোলনের বিভিন্ন অবস্থা, পরিস্থিতি, কায়েমী স্বার্থের বিরোধিতা, সংঘর্ষের বিভিন্ন রূপ এবং এর মোকাবেলা ইত্যাদি উপলক্ষে নাযিলকৃত আয়াত ও সূরাকে বুঝতে হলে ঐ সময়কার পরিবেশকে সামনে রাখতে হবে।

খ. সুতরাং ঐ আন্দোলনের ইতিহাস ও তার বিপ্লবী মহান নেতার জীবনই কুরআনের বাস্তব রূপ ও আসল কুরআন। কিতাবী কুরআনকে ঐ জীবন্ত কুরআন থেকেই বুঝতে হবে—শুধু কিতাব থেকে বুঝা অসম্ভব।

গ. অএতব মুহাম্মাদ (সাঃ)-ই কুরআনের একমাত্র সরকারী ও নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যাদাতা। কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা দানের দায়িত্ব একমাত্র তাঁরই উপর ন্যস্ত ছিল।

ঘ. যুগে যুগে কুরআনের নতুন নতুন ব্যাখ্যা হতে পারে এবং হওয়া উচিতন্ত্—কিন্তু রাসূলের ব্যাখ্যার বিপরীত কোন ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

ঙ. কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যার হেফাযতের প্রয়োজনেই রাসূল (সাঃ)-এর জীবনেতিহাস হাদীসের মাধ্যমে সংরক্ষিত হয়েছে। নইলে কুরআনের ভাষার হেফাযতও অর্থহীন হয়ে পড়তো।

৪. কুরআনের আন্দোলনমুখী তাফসীর

ছাত্র জীবন থেকেই বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত তাফসীর থেকে কুরআন বুঝবার চেষ্টা করেছিলাম। আলেম না হলে কুরআন বুঝা সম্ভব নয় মনে করেই এ চেষ্টায় ক্ষান্ত দিলাম। ১৯৫৪ সালে মরহুম আবদুল খালেক সাহেবের দারসে কুরআন কিছুদিন শুনে সহজ মনে হল। জানতে পারলাম যে মাওলানা মওদূদী (রঃ)-এর লিখিত তাফহীমুল কুরআন থেকেই তিনি দারস দেন। তখন নতুন উৎসাহ নিয়ে এ তাফসীর অধ্যয়নে মনোযোগ দিলাম।

ক. তাফহীমুল কুরআনের বৈশিষ্ট্য

তাফহীমুল কুরআন যে বৈশিষ্ট্যের দরুন বিশেষ মর্যাদার অধিকারী তা এ তাফসীরখানা না পড়া পর্যন্ত বুঝে আসতে পারে না। মধু কেমন তা খেয়েই বুঝতে হয়। অন্যের কথায় মধুর স্বাদ ও মিষ্টতা সঠিকভাবে জানা সম্ভব নয়। নবুওয়াতের ২৩ বছর রাসূল (সাঃ) কালেমা তাইয়েবার দাওয়াত থেকে শুরু করে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সব ক্ষেত্রেই ইকামাতে দ্বীনের যে মহান দায়িত্ব পালন করেছেন সে কাজটি করাবার জন্য কুরআন পাক নাযিল হয়েছে। রাসূল (সাঃ)-এর নেতৃত্বে পরিচালিত ইসলামী আন্দোলনের বিভিন্ন অবস্থায় ও পরিবেশে আল্লাহ পাক প্রয়োজন মতো যখন যে হেদায়াত পাঠিয়েছেন তা-ই গোটা কুরআনে ছড়িয়ে আছে। তাই কুরআনকে আসল রূপে দেখতে হলে রাসূল (সাঃ)-এর ২৩

বছরের সংগ্রামী জীবনের সাথে মিলিয়ে বুঝবার চেষ্টা করতে হবে। তাফহীমুল কুরআন এ কাজটিই করেছে। এখানেই এর বৈশিষ্ট্য।

খ. কুরআন বুঝবার আসল মজা

তাফহীমুল কুরআন একথাই বুঝাবার চেষ্টা করেছে যে, রাসূল (সাঃ)-এর ঐ আন্দোলনকে পরিচালনা করার জন্যই কুরআন এসেছে। তাই কোন্ সূরাটি ঐ আন্দোলনের কোন্ যুগে এবং কি পরিবেশে নাযিল হয়েছে তা উল্লেখ করে বুঝানো হয়েছে যে ঐ পরিস্থিতিতে নাযিলকৃত সূরায় কী হেদায়াত দেয়া হয়েছে। এভাবে আলোচনার ফলে পাঠক রাসূল (সাঃ)-এর আন্দোলনকে এবং সে আন্দোলনে কুরআনের ভূমিকাকে এমন সহজ ও সুন্দরভাবে বুঝতে পারে যার ফলে কুরআন বুঝবার আসল মজা মনে-প্রাণে উপলব্ধি করতে পারে।

তাফহীমুল কুরআন ঈমানদার পাঠককে রাসূল (সাঃ)-এর আন্দোলনের সংগ্রামী ময়দানে নিয়ে হাযির করে। দূর থেকে হক ও বাতিলের সংঘর্ষ না দেখে যাতে পাঠক নিজেকে হকের পক্ষে ও বাতিলের বিরুদ্ধে সক্রিয় দেখতে পায় সে ব্যবস্থাই এখানে করা হয়েছে। ইসলামী আন্দোলনের ও ইকামাতে দ্বীনের সংগ্রামে রাসূল (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-কে যে ভূমিকা পালন করতে হয়েছে তা এ তাফসীরে এমন জীবন্ত হয়ে উঠেছে যে পাঠকের পক্ষে নিরপেক্ষ থাকার উপায় নেই। এ তাফসীর পাঠককে ঘরে বসে শুধু পড়ার মজা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে দেয় না। তাকে ইসলামী আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করে। যে সমাজে সে বাস করে সেখানে রাসূলের সেই সংগ্রামী আন্দোলন না চালালে কুরআন বুঝা অর্থহীন বলে তার মনে হয়। তাফহীমুল কুরআন কোন নিষ্ক্রিয় মুফাসসিরের রচনা নয়। ইকামাতে দ্বীনের আন্দোলনের সংগ্রামী নেতার লেখা এ তাফসীর পাঠককেও সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার তাকিদ দেয়। এটাই এ তাফসীরের বাহাদুরী।

গ. সব তাফসীর এ রকম নয় কেন ?

কারো মনে এ প্রশ্ন জাগতে পারে যে তাফহীমুল কুরআনে আন্দোলনমুখী যে তাফসীর পাওয়া যায় তা অতীতের বিখ্যাত তাফসীরগুলোতে নেই

কেন ? তারা কি কুরআন ঠিকমতো বুঝেননি ? এ প্রশ্নের জওয়াব সুস্পষ্ট হওয়া দরকার।

চৌদ্দশ বছর আগে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) কুরআনের ভিত্তিতে সমাজ ও রাষ্ট্র এমনভাবে গড়ে তুলেছিলেন যে প্রায় বারশ বছর বিশ্বে মুসলমানদেরই নেতৃত্ব ছিল। খোলাফায়ে রাশেদার ত্রিশ বছর ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা শতকরা একশ ভাগই চালু ছিল। এরপর খেলাফতের স্থলে রাজতন্ত্র চালু হলেও শিক্ষাব্যবস্থা, আইনব্যবস্থা, অর্থব্যবস্থা ইসলাম অনুযায়ীই চলতে থাকে। ইসলামী শাসনব্যবস্থায় ক্রমে ক্রমে ত্রুটি দেখা দেবার ফলে বারশ বছর পর শাসনক্ষমতা অমুসলিমদের হাতে চলে যায়।

যে বারশ বছর মুসলিম শাসন ছিল তখন যেসব তাফসীর লেখা হয়েছে, মুসলিম সমাজে কুরআনের শিক্ষা ব্যাপক করাই এর উদ্দেশ্য ছিল। ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম থাকার কারণে কুরআনকে আন্দোলনের কিতাব হিসাবে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন তখন ছিল না।

যখন ইংরেজ শাসন এ উপমহাদেশে ইসলামকে জীবনের সকল ক্ষেত্র থেকে উৎখাত করে কুরআনের বিপরীত শিক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতি চালু করল তখন নতুন করে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েমের আন্দোলন জরুরী হয়ে পড়ল। শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী (রঃ) থেকেই এ চিন্তার সূচনা হয়। এ চিন্তাধারার ধারকগণই মুজাহিদ আন্দোলন গড়ে তোলেন এবং উত্তর পশ্চিম সীমান্তে একটি ইসলামী রাষ্ট্রও কায়েম করেন। ১৮৩১ সালে বালাকোটের যুদ্ধে নেতৃবৃন্দ শহীদ হলেও ইসলামকে বিজয়ী করার চিন্তাধারা বিলুপ্ত হয়নি।

মাওলানা মওদূদী (রঃ) ঐ চিন্তাধারার স্বার্থক ধারক হওয়ার সাথে সাথে নিজেই ইসলামী আন্দোলনের নেতৃত্বের দায়িত্ব পালন করার ফলে আন্দোলনের দৃষ্টিতে কুরআনকে বুঝাবার গুরুত্ব উপলব্ধি করেছেন। তাই তাঁর তাফসীর স্বাভাবিকভাবেই আন্দোলনমুখী হয়েছে।

৫. গোটা কুরআনের পটভূমি ঃ বিশ্ব ও মানবজাতি সম্পর্কে এর রচয়িতার চিন্তাধারা ঃ কুরআনের প্রতি কেউ ঈমান আনুক বা না-ই আনুক, কুরআনের বক্তব্যকে বুঝতে হলে ঐ চিন্তাধারা জানা অপরিহার্য

ক. বিশ্ব-স্রষ্টা মানুষকে জ্ঞান ও চিন্তার ক্ষমতা এবং ভালো-মন্দ বাছাইয়ের প্রতিভাসহ নিজের খলীফার দায়িত্ব দিয়েছেন।

খ. মানুষকে তিনি অজ্ঞানতার অন্ধকারে ছেড়ে দেননি। ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি, ইলহাম ও অহীর মাধ্যমে জ্ঞান দানের ব্যবস্থা করেছেন। তাই প্রথম মানুষকেই রাসূল হিসেবে পাঠিয়েছেন। তাঁকে যে জীবন বিধান দিয়েছেন তারই নাম ইসলাম।

গ. প্রথম মানুষ থেকেই জানান হয়েছে যে, সমস্ত সৃষ্টির উপর আল্লাহরই কর্তৃত্ব রয়েছে। সবার বিধানদাতা একমাত্র তিনিই। কেউ স্বাধীন নয়, আনুগত্য পাওয়ার অধিকার একমাত্র তাঁরই। মানব দেহ সহ সবার জ ন্যই তিনি আইন রচনা করেন এবং তা নিজেই জারী করেন।

ঘ. সমগ্র সৃষ্টিজগতকে ব্যবহার করার অধিকার একমাত্র মানুষকেই দেয়া হয়েছে এবং বস্তুজগতকে ব্যবহারের যোগ্য একটি দেহতন্ত্র এজন্যই তাকে দান করা হয়েছে।

ঙ. বিশ্বজগত ও মানব দেহকে ব্যবহার করার ব্যাপারে মানুষকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়া হয়নি, স্বায়ত্বশাসন দেয়া হয়েছে মাত্র।

চ. এ স্বায়ত্বশাসনটুকুও কর্মসম্পাদনের ব্যাপারে দেননি, কর্মের ইচ্ছা ও চেষ্টার ক্ষেত্রে মাত্র দিয়েছেন।

ছ. নবীর মাধ্যমে প্রেরিত বিধানকে মানুষের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়নি। ইচ্ছাশক্তি ও চেষ্টা সাধনাকে স্রষ্টার বিধান অনুযায়ী ব্যবহার করলে দুনিয়াতে শান্তি ও আখিরাতে মুক্তি, আর অন্যথা হলে দুনিয়ায় অশান্তি ও আখিরাতে শাস্তি হবে বলে জানিয়ে দেয়া হয়েছে।

জ. মানুষের পার্থিব জীবন আখিরাতের তুলনায় ক্ষণিকমাত্র এবং পার্থিব জীবনের ফলাফলই আখিরাতে দেয়া হবে। তাই দুনিয়ার জীবনটা পরীক্ষা মাত্র। প্রতি মুহূর্তেই এ পরীক্ষা চলছে।

ঝ. এ পরীক্ষায় মানুষ কি কারণে ফেল করে ? বস্তুজগতের প্রতি বস্তুজ্ঞান সর্বস্ব ও নীতিজ্ঞান বর্জিত দেহের তীব্র আকর্ষণ রয়েছে। নাফস বা দেহের (বস্তুগত অস্তিত্ব) দাবী ও রূহের (নৈতিক অস্তিত্ব) স্বাভাবিক সংঘর্ষে মানুষের পরাজয় হলেই সে পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়।

ঞ. দুনিয়ায় মানুষের কর্মের শুধু বস্তুগত ফলই প্রকাশ পায়, নৈতিক ফল সামান্যই দেখা যায়। তাই নৈতিক জীব হিসাবে মানুষকে পরকালেই কর্মের নৈতিক ফল দেয়া হবে।

ট. রূহ্ বা নৈতিক সত্তা বা প্রকৃত মানুষ যদি জগৎ ও জীবন এবং দুনিয়া ও আখিরাত সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান পেতে চায় তাহলে বস্তুগত জ্ঞান মোটেই যথেষ্ট নয়। অহীর মাধ্যমে তাকে এমন কতক মৌলিক জ্ঞান পেতে হবে যা ঈমানের (অদৃশ্যে বিশ্বাস) মাধ্যমেই পাওয়া সম্ভব।

ঠ. জীবন সমস্যার মোকাবেলা করে জীবনকে সঠিক পথে চালাবার বাস্তব শিক্ষা দেবার জন্য যুগে যুগে নবী ও রাসূল পাঠানো হয়েছে।

ড. সব নবীর দ্বীনই (আনুগত্যের নীতি–আল্লাহর আনুগত্য) এক ছিল অবশ্য সমাজ বিবর্তনের প্রয়োজনে তাঁদের সবার শরীয়াত এক ছিল না।

ঢ. মানব সমাজের পূর্ণ বিকাশের যুগে সর্বশেষ রাসূল পাঠানো হলো। মূল দ্বীনের চিরন্তন শিক্ষা ও পূর্ণাঙ্গ শরীয়াত, কুরআন ও সুন্নাহর মধ্যেই রয়েছে।

ণ. পূর্ববর্তী সব কিতাব বিকৃত হয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক ছিল। সর্বশেষ কিতাব চিরস্থায়ী থাকবে।

ত. এক স্রষ্টা তাঁর প্রিয় মানব জাতির জন্য ভিন্ন ভিন্ন বিধান বা ধর্ম পাঠাননি। একই মূল বিধান (স্রষ্টার আনুগত্য–ইসলাম) প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে পূর্ণাঙ্গরূপে মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর নিকট প্রেরিত হয়েছে।

থ. নবীগণ তাঁদের দায়িত্ব যথাযথই পালন করেছেন। কিন্তু যখনই দুটো শর্ত পূর্ণ হয়েছে তখনই ইসলামী বিধান বিজয়ী হয়েছে—একদল যোগ্য লোক তৈরী হওয়া ও জনগণ এর সক্রিয় বিরোধী না হওয়া—এ দুটো শর্ত একত্র না হলে বিজয় অসম্ভব।

দ. মুহাম্মাদ (সাঃ)-কে সর্ব যুগের জন্য মানব জাতির উৎকৃষ্টতম আদর্শ হিসাবেই পাঠানো হয়েছে এবং একমাত্র তাঁর অনুসরণের মাধ্যমেই আল্লাহর সন্তুষ্টি, পার্থিব সাফল্য ও পরকালীন পুরস্কার পাওয়া সম্ভব।

ধ. সকল নবী ও রাসূলকে অনুসরণ করার একমাত্র উপায় হলো মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর অনুসরণ।

ন. আল্লাহ পাক তাঁর দ্বীন ও শরীয়াতকে মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর মাধ্যমে পূর্ণ করায় আর কোন রাসূল বা নবী পাঠাবার প্রয়োজন রইল না।

৬. সমাজ বিপ্লবের উপযোগী আন্দোলনের পরিচয়

ক. সমাজ বিপ্লবের উদ্দেশ্যে পরিচালিত আন্দোলনের সাথে প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা ও কায়েমী স্বার্থের সংঘর্ষ অনিবার্য।

খ. এ ধরনের আন্দোলন সমাজের মানুষকে প্রধানতঃ দুভাগে বিভক্ত করেঃ

১. বিপ্লবের অনুসারী–প্রধানতঃ যারা প্রচলিত সমাজের সুবিধাভোগী নয়।

২. বিপ্লব বিরোধী–প্রচলিত সমাজের কায়েমী স্বার্থ বা সুবিধাভোগী।

গ. উভয় পক্ষে সাহসী ও মযবুত লোকের সংখ্যা কম হলেও অনেক লোক উভয় পক্ষের সমর্থক হয়—যদিও তারা বেশীর ভাগই নিষ্ক্রিয় থাকে।

ঘ. সর্ব সাধারণ অধিকাংশ লোক নিরপেক্ষ থাকে বা পরিস্থিতি বিবেচনা করতে থাকে–যে দিকে জয় হয় সে দিকেই সায় দেয়।

ঙ. বিপ্লবী আদর্শের মুমিন (অনুসারী) ও কাফির (বিরোধী) ছাড়া আন্দোলনের বিভিন্ন সময় ৫ রকম মুনাফিকের আবির্ভাব হয় ঃ

১. দুর্বল মুমিন	সংগ্রাম যুগে।
২. দুর্বল কাফির	সংগ্রাম যুগে অল্প এবং বিজয় যুগে বেশী।
৩. সন্দেহ পরায়ণ ('মুযাবযাবীন')	উভয় যুগে।
৪. মুমিন বেশে কাফির	বিজয় যুগে।
৫. বাধ্য হয়ে মুমিন	চূড়ান্ত বিজয়ের পর।

চ. আন্দোলনের বিভিন্ন স্তরে বিরোধিতার রূপ	মোকাবেলার ধরন	সংঘর্ষের ফলাফল
১. বিদ্রূপ	ধৈর্যের সাথে দাওয়াত দেয়া	সংখ্যা বৃদ্ধি।
২. মিথ্যা প্রচার	যুক্তিদ্বারা খণ্ডন	সংখ্যা বৃদ্ধি।
৩. নির্যাতন	আদর্শের মজবুতীকরণ সাহসী লোক বাছাই।	দুর্বল লোক ছাঁটাই।

৭. রাসূল (সাঃ)-এর আন্দোলনের বিভিন্ন যুগ ও স্তর

ক) রাসূল (সাঃ)-এর আন্দোলনের দুটো যুগ ঃ

১. মাক্কী যুগ–প্রথম ১৩ বছর। এটা সংগ্রাম যুগ, লোক তৈরীর যুগ বা ব্যক্তি গঠনের যুগ ও নির্যাতনের যুগ।

২. মাদানী যুগ–হিজরাতের পর ১০ বছর। এটা বিজয় যুগ, সমাজ গঠনের যুগ, রাষ্ট্র পরিচালনার যুগ ও সশস্ত্র মোকাবেলার যুগ।

খ) মাক্কী যুগের বিভিন্ন স্তর ঃ

তাফহীমুল কুরআনে সূরা আল-আনয়ামের ভূমিকায় এর বিস্তারিত আলোচনা আছে।

১. ব্যক্তিগতভাবে বা গোপনে (আণ্ডার গ্রাউণ্ড) দাওয়াত ও সংগঠনের সময়কাল–৩ বছর।

২. প্রকাশ্যে দাওয়াত–বিরোধীদের বিদ্রূপ ও অপপ্রচার এবং নির্যাতনের প্রাথমিক অবস্থার সময়কাল–২ বছর।

নবুওয়াতের ৫ম বছর রজব মাসে পয়লা কিস্তিতে ১৬জন (৪জন মহিলাসহ) হাবশায় হিজরাত করেন। ২য় কিস্তিতে ১৫জন মহিলা ও ৮৮জন পুরুষ হিজরাত করেন।

৩. বিভিন্ন ধরনের অত্যাচার ও নির্যাতন কাল–৫ বছর। নবুওয়াতের ৭ম থেকে ৯ম বছর পূর্ণ ৩ বছর রাসূল (সাঃ)-এর নিজ বংশ ‘বনী হাশিম’ সহ ‘শে’বে আবু তালিব’ নামক উপত্যকায় কঠোর বন্দী

দশা। ১০ম বছরে রাসূল (সাঃ)-এর চাচা আবু তালিব ও বিবি খাদিজা (রাঃ) ইন্তেকাল করেন।

৪. মাক্কী যুগের শেষ ৩ বছর চরম বিরোধিতা, নিষ্ঠুর নির্যাতন, এমনকি রাসূল (সাঃ)-কে হত্যার চেষ্টা চলে। এ ৩ বছরে প্রত্যেক হজ্জের সময় মদীনা থেকে আগত লোকেরা ইসলাম কবুল করতে থাকেন। পয়লা বছর ৬জন, ২য় বছর ১২জন বাইয়াত হন (১ম বাইয়াতে আকাবা) এবং শেষ বছর ৭৫জন বাইয়াত হন (২য় বাইয়াতে আকাবা)।

গ) মাদানী যুগের বিভিন্ন স্তর–মোট ১০বছর।

১. বদর যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত–১ বছর ৬ মাস।

২. বদর থেকে হোদায়বিয়ার সন্ধি পর্যন্ত–৪ বছর ২ মাস।

৩. মক্কা বিজয় পর্যন্ত–১ বছর ১০ মাস।

৪. মক্কা বিজয়ের পর–২ বছর ৬ মাস।

৮. মাদানী যুগের বড় বড় ঘটনার সময়কাল

১. হিজরাত–১২ রবিউল আউয়াল ১ হিজরী জুময়ার দিন মদীনায় পৌঁছেন।

২. বদর যুদ্ধ–রমযান ২য় হিজরী

৩. ওহুদ যুদ্ধ–শাওয়াল ৩য় হিজরী

৪. বানূ নাযীরের বিরুদ্ধে অভিযান–রবিউল আউয়াল ৪র্থ হিজরী।

৫. খন্দকের যুদ্ধ (আহযাব)–শাওয়াল ৬ষ্ঠ হিজরী

৬. হোদায়বিয়ার সন্ধি ও বাইয়াতে রিদওয়ান–যিলকাদ ৬ষ্ঠ হিজরী।

৭. খায়বার যুদ্ধ–মুহাররাম ৭ম হিজরী।

৮. মক্কা বিজয়–রমযান ৮ম হিজরী।

৯. হুনাইনের যুদ্ধ–শাওয়াল ৮ম হিজরী।

১০. তাবুকের যুদ্ধ–রজব ৯ম হিজরী।

১১. বিদায় হজ্জ–যিলহজ্জ ১০ হিজরী।

৯. মাক্কী সূরার বৈশিষ্ট্য (হিজরাতের পূর্বে অবতীর্ণ)

ক) প্রথম দিকের সূরার বৈশিষ্ট্য ঃ

১. রাসূলকে দেয়া বিরাট দায়িত্ব পালনের উপযোগী উপদেশ।

২. জীবন ও জগত সম্পর্কে প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন ও সঠিক বিশ্বাস সৃষ্টির চেষ্টা, ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষাকে বিভিন্ন ভাবে পেশ করা—তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের বেশী চর্চা।

৩. মানুষের ঘুমন্ত বিবেক ও নৈতিকতাবোধ জাগ্রত করে চিন্তাশক্তিকে সত্য গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা।

৪. প্রাথমিক সূরাগুলোর ভাষা স্বচ্ছ, ঝর্ণাধারার মত ঝরঝরে, ছোট ছোট ছন্দময় আয়াত ; অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও হৃদয়গ্রাহী, সহজে মুখস্থ হবার যোগ্য, অতি উন্নত সাহিত্য।

খ) মাক্কী সূরা ব্যক্তি গঠনের হেদায়াতপূর্ণ—তাতে সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের আইন বিধান নেই। শুধু শেষ দিকে সমাজ গঠনের ইংগিতমূলক কথা 'ম্যানিফেস্টো' আকারে আছে। অতীতে বিভিন্ন জাতির নিকট নবীর আগমন—নবীর প্রতি জনগণের আচরণের ভিত্তিতে তাদের উত্থান পতনের বর্ণনা (ইতিহাস জানার জন্য নয় ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণের জন্য)।

গ) কাফির ও মুশরিকদের বিরোধিতার বিভিন্ন অবস্থায় ধৈর্যের উপদেশ, বিরোধিতার জবাব ও মোকাবেলা করার পন্থা।

১০. মাদানী সূরার বৈশিষ্ট্য ঃ হিজরাতের পর অবতীর্ণ সূরা—মক্কায় নাযিল হলেও মাদানী হিসাবে গণ্য

১. দীর্ঘ সূরা (অধিকাংশ),

২. সমাজ গঠনের বিধান,

ক) ফৌজদারী আইন, উত্তরাধিকার বিধান, বিয়ে-তালাক, যাকাত ও ওশর ইত্যাদির নিয়ম কানুন।

খ) দল, রাষ্ট্র, সভ্যতা ও সামাজিকতার ভিত্তি,

গ) মুনাফিক, কাফির, যিম্মি, আহলে কিতাব, যুদ্ধমান শত্রু ও সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ জাতির প্রতি আচরণ।

ঘ) জয়-পরাজয়, বিপদ-শান্তি, নিরাপত্তা-ভীতি ইত্যাদি অবস্থায় মুসলমানদের কর্তব্য।

১১. কুরআনের অন্যান্য বৈশিষ্ট্য

ক) কুরআনের বাচনভংগী ঃ

–একটি বিপ্লবী আন্দোলনের উপযোগী

–সমর্থকদের উদ্দীপিত করার মত সম্মোহক

–বিরোধীদের প্রতিহত করায় বলিষ্ঠ

–বিপ্লবী নেতার ঝংকারময় ভাষণ

–মন-মগজ বুদ্ধি-বিবেককে উদ্বুদ্ধ করার মতো এবং ভাবাবেগের প্লাবন সৃষ্টি করার যোগ্য।

–দরদী মন দিয়ে মানুষের হৃদয় জয় করার মতো আবেগ ও আবেদনময় আহ্বান।

খ) কুরআনে কেন একই কথা বার বার উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

১. আন্দোলনের বিশেষ এক অধ্যায়ে যেসব কথা মন-মগজে বসান দরকার তা বারবারই বলা দরকার।

২. বারবার একই ভাষা বা শব্দে, নতুন ভংগীতে ও আকর্ষণীয় পদ্ধতিতে একটি কথাকে পূর্ণরূপে হজম করাবার জন্যই বারবার বলা হয়েছে।

৩. আল্লাহর গুণাবলী, তাওহীদ, রিসালাত, আখিরাত, কিতাব, ঈমান, তাকওয়া, সবর, তাওয়াক্কুল ইত্যাদি এমন গুরুত্বপূর্ণ যে এ সবের পুনরুক্তি ব্যাপক হওয়াই স্বাভাবিক এবং আন্দোলনের সকল স্তরে এর প্রয়োজন।

গ) কুরআন হলো ব্লু-প্রিন্ট বা ইসলামী বিধানের নীল নকশা। আল্লাহর তৈরী এ নীল নকশা অনুযায়ী ইসলামের বিরাট সৌধ গড়ার দায়িত্ব যে ইঞ্জিনিয়ারকে দেয়া হয়েছে তিনিই হলেন রাসূল

(সাঃ)। তিনি কুরআনে দেয়া পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করে ইসলামের পরিপূর্ণ রূপ প্রকাশ করেছেন।

১২. মাক্কী ও মাদানী সূরার সংখ্যা

ক) মোট ১১৪টি সূরার মধ্যে ১৭টি সূরা সম্পর্কে মতভেদ দেখা যায়। এর মধ্যে ৫টি সূরা নিয়ে ব্যাপক মতভেদ আছে। বাকী ১২টির মধ্যে অধিকাংশের মতে ৪টি মাদানী ও ৮টি মাক্কী।

১. যে ৫টি সূরা সম্পর্কে ব্যাপক মতভেদ আছে—আল বাইয়েনাহ (৯৮), আল আদিয়াহ (১০০), আল মাউন (১০৭), আল ফালাক (১১৩) ও আন নাস (১১৪)।

২. অধিকাংশের মতে যে ৪টি সূরা মাদানী ঃ
আর-রা'দ (১৩), আর-রহমান (৫৫), আদ-দাহর (৭৬) ও আল যিলযাল (৯৯)।

৩. অধিকাংশের মতে যে ৮টি সূরা মাক্কী ঃ
আত্-তীন (৯৫), আল কদর (৯৭), আত্-তাকাসুর (১০২), আল আসর (১০৩), আল কুরাইশ (১০৬), আল কাউসার (১০৮), আল কাফিরূন (১০৯) ও আল ইখলাস (১১২)।

খ) তাফহীমুল কুরআনে সূরাগুলোর ভূমিকায় মাওলানা মওদূদী (রঃ) সূরাসমূহের নাযিল হবার সময় নিয়ে যে গবেষণামূলক আলোচনা করেছেন তাতে মাত্র ২৫টি সূরা মাদানী বলে প্রমাণিত হয়। সে হিসাবে ১১৪−২৫=৮৯টি সূরাই মাক্কী বলে সাব্যস্ত হয়। অবশ্য তিনি তাফহীমে ৫৫ ও ৯৯নং সূরার শিরোনামে মাদানী লিখেছেন —যদিও গবেষণায় মাক্কী প্রমাণ করেছেন। আবার ১০৭নং সূরার শিরোনামে মাক্কী লিখেও গবেষণায় মাদানী প্রমাণ করেছেন। কিন্তু তাঁর তরজমায়ে কুরআন মজীদে ১৩ ও ৭৬নং সূরার শিরোনামে মাদানী লিখেছেন।

গ) অধিকাংশের মতে, ২৮টি মাদানী সূরা এবং ৮৬টি মাক্কী সূরা। মাওলানা মওদূদী তাফহীমে ২৭টি এবং তরজমায়ে কুরআন মজীদে ২৯টি সূরার শিরোনামে মাদানী লিখেছেন।

ঘ) কুরআনের শেষ দু পারায় অধিকাংশ মাক্কী সূরা রয়েছে। ২৯ পারার ১১টি সূরার সবই মাক্কী এবং আমপারার ৩৭টির মধ্যে ৩৪টিই মাক্কী। মোট ৮৯টি মাক্কী সূরার ৪৫টিই শেষ দু পারায় এবং বাকী ৪৪টি সমগ্র কুরআনে ছড়িয়ে আছে।

ঙ) কতক সূরার প্রথম ভাগ মাক্কী হওয়ায় পরবর্তী অংশ মাদানী হওয়া সত্ত্বেও সেসব সূরা মাক্কী হিসাবে পরিচিত। যেমন সূরা মুয্যাম্মিল।

১৩. মাক্কী যুগের সূরার তালিকা

সূরার নং	সূরার নাম	পারার নং
১	আল ফাতিহা	১
৬	আল-আনয়াম	৭/৮
৭	আল-আ'রাফ	৮/৯
১০	ইউনুস	১১
১১	হুদ	১২
১২	ইউসুফ	১২/১৩
১৩	আর-রা'দ	১৩
১৪	ইবরাহীম	১৩
১৫	আল-হিজর	১৪
১৬	আন-নাহল	১৪
১৭	বনী ইসরাঈল (আল-ইসরা)	১৫
১৮	আল-কাহাফ	১৫/১৬
১৯	মারইয়াম	১৬
২০	তোয়াহা	১৬
২১	আল-আম্বিয়া	১৭
২৩	আল-মু'মিনূন	১৮
২৫	আল-ফুরকান	১৮/১৯
২৬	আশ-শুয়ারা	১৯
২৭	আন্-নামল	১৯/২০
২৮	আল-কাসাস	২০

সূরার নং	সূরার নাম	পারার নং
২৯	আল-আনকাবুত	২০/২১
৩০	আর-রূম	২১
৩১	লুকমান	২১
৩২	আস-সাজদাহ	২১
৩৪	সাবা	২২
৩৫	ফাতের (আল মালাইকাহ)	২২
৩৬	ইয়াসীন	২২/২৩
৩৭	আস-সাফ্‌ফাত	২৩
৩৮	সোয়াদ	২৩
৩৯	আয্‌-যুমার	২৩/২৪
৪০	আল-মু'মিন (গাফির)	২৫
৪১	হা-মীম আস-সাজদাহ (ফুস্‌সিলাত)	২৫
৪২	আশ-শূরা	২৫
৪৩	আয্‌-যুখরুফ	২৫
৪৪	আদ-দোখান	২৫
৪৫	আল-জাসিয়া	২৫
৪৬	আল-আহকাফ	২৬
৫০	কাফ	২৬
৫১	আয-যারিয়াত	২৬/২৭
৫২	আত-তূর	২৭
৫৩	আন-নাজম	২৭
৫৪	আল-কামার	২৭
৫৫	আর-রহমান	২৭
৫৬	আল-ওয়াকিয়া	২৭
৬৭	আল-মুলক	২৯
৬৮	আল-কালাম	২৯
৬৯	আল-হাক্কাহ	২৯
৭০	আল-মায়ারিজ	২৯

সূরার নং	সূরার নাম	পারার নং
৭১	নূহ	২৯
৭২	আল-জ্বিন	২৯
৭৩	আল-মুয্যাম্মিল	২৯
৭৪	আল-মুদ্দাসসির	২৯
৭৫	আল-কিয়ামাহ	২৯
৭৬	আদ-দাহর (আল-ইনসান)	২৯
৭৭	আল-মুরসালাত	২৯
৭৮	আন-নাবা	৩০
৭৯	আন-নাযিয়াত	
৮০	আবাসা	”
৮১	আত-তাকভীর	
৮২	আল-ইনফিতার	”
৮৩	আল-মুতাফফিফীন (আত-তাতফীফ)	
৮৪	আল-ইনশিকাক (ইনশাককাত)	
৮৫	আল-বুরুজ	
৮৬	আত-তারিক	”
৮৭	আল-আ'লা	
৮৮	আল-গাশিয়া	
৮৯	আল-ফাজর	
৯০	আল-বালাদ	
৯১	আশ-শামস	
৯২	আল-লাইল	”
৯৩	আদ্-দোহা	
৯৪	আলাম-নাশরাহ	”
৯৫	আত-ত্বীন	
৯৬	আল-আলাক (ইকরা)	”

সূরার নং	সূরার নাম	পারার নং
৯৭	আল-কাদর	৩০
৯৯	আয-যিলযাল	
১০০	আল-আদিয়াহ	
১০১	আল-কারিয়াহ	
১০২	আত্-তাকাসুর	
১০৩	আল-আসর	
১০৪	হুমাযা	
১০৫	আল-ফীল	
১০৬	কুরাইশ	
১০৮	আল-কাউছার	
১০৯	আল-কাফিরুন	
১১১	লাহাব (আল-মাসাদ বা তাব্বাত)	
১১২	আল-ইখলাস	
১১৩	আল-ফালাক	
১১৪	আন্-নাস	

১৪. মাদানী যুগের সূরার তালিকা

সূরার নং	সূরার নাম	পারার নং
২	•আল-বাকারাহ	১-৩
৩	আলে-ইমরান	৩-৪
৪	আন-নিসা	৪-৫
৫	আল-মায়িদা	৭
৮	আল-আনফাল	৯-১০
৯	আত-তাওবা (বারা-আত)	১০-১১
২২	আল-হাজ্জ	১৭
২৪	আন-নূর	১৮

সূরার নং	সূরার নাম	পারার নং
৩৩	আল-আহযাব	২২
৪৭	মুহাম্মাদ (আল-কিতাল)	২৬
৪৮	আল-ফাতহ	২৬
৪৯	আল-হুজুরাত	২৬
৫৭	আল-হাদীদ	২৮
৫৮	আল-মুজাদালা	২৮
৫৯	আল-হাশর	২৮
৬০	আল-মুমতাহিনা	২৮
৬১	আস-সফ	২৮
৬২	আল-জুমুআ	২৮
৬৩	আল-মুনাফিকুন	২৮
৬৪	আত-তাগাবুন	২৮
৬৫	আত-তালাক	২৮
৬৬	আত-তাহরীম	২৮
৯৮	আল-বাইয়্যেনাহ	৩০
১০৭	আল-মাউন	৩০
১১০	আন-নাসর	৩০

১৫. মাক্কী যুগের বিভিন্ন স্তরে অবতীর্ণ সূরার শ্রেণীবিন্যাস

কুরআন পাক রাসূল (সাঃ)-এর নেতৃত্বে পরিচালিত ইসলামী আন্দোলনের বিভিন্ন অবস্থায় প্রয়োজনীয় হেদায়াতেরই সমষ্টি। তাই কোন্ যুগের কোন্ স্তরে কোন্ কোন্ সূরা নাযিল হয়েছিল তা জানতে পারলে কুরআনের মর্ম উদ্ধার করা সহজ হয়।

বিশেষ করে মাক্কী যুগের বিভিন্ন স্তরের সাথে মিলিয়ে সূরাগুলোর শ্রেণীবিন্যাস বেশী প্রয়োজন। কিন্তু এ কাজটি বেশ কঠিন। মাদানী সূরা নাযিলের সময় নির্ধারণ যতটা সহজ মাক্কী যুগের বেলায় সে কাজটি ততটাই দুঃসাধ্য। তবুও সার্থকভাবে কুরআনকে বুঝবার প্রয়োজনে

মাওলানা মওদূদীর (রঃ) তাফসীরে দেয়া গবেষণার ভিত্তিতে মাক্কী যুগের চারটি স্তরের নিম্নরূপ শ্রেণী বিন্যাস করা যায় ঃ

প্রথম স্তরে মোট ২৮টি, দ্বিতীয় স্তরে ১১, তৃতীয় স্তরে ৩৭ ও চতুর্থ স্তরে ১৩টি সূরা =মোট ৮৯টি।

ক) মাক্কী যুগের প্রথম স্তরে (৩ বছরে) যে ২৮টি সূরা নাযিল হয়েছে তার তালিকা ঃ

ক্রমিক নং	পারার নং	সূরার নাম	সূরার নং
১	১	আল-ফাতিহা	১
২	২৭	আর রাহমান	৫৫
৩	২৯	আল জ্বিন	৭২
৪	২৯	আল মুয্‌যাম্মিল (প্রথমাংশ)	৭৩
৫	২৯	আল মুদ্দাসসির (১ম ৭ আয়াত)	৭৪
৬	২৯	আল-কিয়ামাহ্	৭৫
৭	২৯	আদ-দাহর	৭৬
৮	২৯	আল-মুরসালাত	৭৭
৯	৩০	আন-নাবা	৭৮
১০	৩০	আন-নাযিয়াত	৭৯
১১	৩০	আত-তাকভীর	৮১
১২	৩০	আল-ইনফিতার	৮২
১৩	৩০	আল-ইনশিকাক	৮৪
১৪	৩০	আল-আ'লা	৮৭
১৫	৩০	আদ-দোহা	৯৩
১৬	৩০	আলাম নাশরাহ	৯৪
১৭	৩০	আত-তীন	৯৫
১৮	৩০	আল-আলাক	৯৬
১৯	৩০	আল-কাদর	৯৭
২০	৩০	আয-যিলযাল	৯৯
২১	৩০	আল-আদিয়াত	১০০
২২	৩০	আল-কারিয়াহ	১০১

ক্রমিক নং	পারার নং	সূরার নাম	সূরার নং
২৩	৩০	আত-তাকাসুর	১০২
২৪	৩০	আল-আসর	১০৩
২৫	৩০	আল-হুমাযা	১০৪
২৬	৩০	আল-ফীল	১০৫
২৭	৩০	আল-কুরাইশ	১০৬
২৮	৩০	আল-ইখলাস	১১২

খ) মাক্কী যুগের দ্বিতীয় স্তরের দু বছরে নাযিলকৃত ১১টি সূরার তালিকা

ক্রমিক নং	পারার নং	সূরার নাম	সূরার নং
১	২৩	সোয়াদ	৩৮
২	২৬	কাফ (শেষ দিকে)	৫০
৩	২৬-২৭	আয-যারিয়াত (শেষ দিকে)	৫১
৪	২৭	আত-তূর (শেষ দিকে)	৫২
৫	২৯	আল মুলক	৬৭
৬	২৯	আল-হাক্কাহ	৬৯
৭	২৯	আল-মায়ারিজ	৭০
প্রথম স্তরের ৫ নম্বরে গণ্য	২৯	আল মুদ্দাসসির ৮ম আয়াত থেকে সবটুকু সূরা	৭৪
৮	৩০	আবাসা	৮০
৯	৩০	আল-মুতাফফিফীন	৮৩
১০	৩০	আত-তারিক	৮৬
১১	৩০	আল-গাশিয়া	৮৮

গ) মাক্কী যুগের তৃতীয় স্তরের ৫ বছরে অবতীর্ণ সূরার তালিকা

ক্রমিক নং	পারার নং	সূরার নাম	সূরার নং
১	১৫-১৬	আল কাহ্ফ হিজরাতে হাবশার পূর্বে	১৮
২	১৬	মারইয়াম (ঐ)	১৯

ক্রমিক নং	পারার নং	সূরার নাম	সূরার নং
৩	১৬	তোয়াহা [হযরত ওমরের (রাঃ) ইসলাম গ্রহণের পূর্বে]	২০
৪	১৭	আল আম্বিয়া (৩য় স্তরের ১ম দিকে)	২১
৫	১৮	আল মু'মিনূন (হযরত ওমরের ইসলাম গ্রহণের পর এবং দুর্ভিক্ষের সময়)	২৩
৬	১৮-১৯	আল ফুরকান	২৫
৭	১৯	আশ শুয়ারা (সূরা তোয়াহা ও ওয়াকেয়ার পর)	২৬
৮	১৯-২০	আন্ নাম্‌ল (শুয়ারার পর)	২৭
৯	২০	আল কাসাস (নামলের পর)	২৮
১০	২০-২১	আল্ আনকাবুত (হিজরাতে হাবশার পূর্বে)	২৯
১১	২১	আর রূম (হাবশার পরে)	৩০
১২	২১	লুকমান (আনকাবুতের পর)	৩১
১৩	২১	আস সাজদা (১ম দিকে)	৩২
১৪	২২	আস্ সাবা (১ম দিকে)	৩৪
১৫	২২	আল ফাতির (১ম দিকে)	৩৫
১৬	২২-২৩	ইয়াসীন (৩য় স্তরের শেষ দিকে বা ৪র্থ এর প্রথম দিকে)	৩৬
১৭	২৩	আস্ সাফ্‌ফাত (ইয়াসীনের সাথে সাথে)	৩
১৮	২৩-২৪	আয্ যুমার (হাবশার পূর্বে)	৩৯
১৯	২৪	আল মু'মিন (যুমারের পর)	৪০
২০	২৪-২৫	হা-মীম আস-সাজদা [হামযা (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণের পর ও ওমর (রাঃ)-এর পূর্বে]	৪১
২১	২৫	আশ-শূরা (হা-মীম আস-সাজদার পর)	৪২
২২	২৫	আদ্ দোখান (দুর্ভিক্ষের সময়)	৪৪
২৩	২৫	আল-জাসিয়া (দোখানের পর)	৪৫
২৪	২৭	আন্ নাজম (হাবশার পর)	৫৩
২৫	২৭	আল-কামার (৮ম নাবাভীতে)	৫৪
২৬	২৭	আল ওয়াকেয়াহ [হাবশার পর ওমর (রাঃ) এর ইসলাম গ্রহণের পূর্বে]	৫৬

ক্রমিক নং	পারার নং	সূরার নাম	সূরার নং
২৭	২৯	আল কালাম (১ম দিকে)	৬৮
২৮	২৯	নূহ (১ম দিকে)	৭১
২৯	৩০	আল-বুরুজ (শেষ দিকে)	৮৫
৩০	৩০	আল-ফাজর (১ম দিকে)	৮৯
৩১	৩০	আশ-শামস	৯১
৩২	৩০	আল-লাইল	৯২
৩৩	৩০	আল-কাউসার	১০৮
৩৪	৩০	আল-কাফিরূন	১০৯
৩৫	৩০	আল-লাহাব	১১১
৩৬	৩০	আল-ফালাক	১১৩
৩৭	৩০	আন-নাস	১১৪

ঘ) মাক্কী যুগের ৪র্থ স্তরের ৩ বছরে নাযিল হওয়া ১৩টি সূরার তালিকা

ক্রমিক নং	পারার নং	সূরার নাম	সূরার নং
১	৭-৮	আল-আনয়াম	৬
২	৮-৯	আল-আ'রাফ	৭
৩	১১	ইউনুস	১০
৪	১২	হূদ	১১
৫	১২-১৩	ইউসুফ	১২
৬	১৩	আর-রা'দ	১৩
৭	১৩	ইবরাহীম	১৪
৮	১৪	আল-হিজর	১৫
৯	১৪	আন-নাহল	১৬
১০	১৫	বনী ইসরাঈল	১৭
১১	২৫	আয্-যুখরুফ [রাসূল (সাঃ)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র]	৪৩
১২	২৬	আল-আহকাফ	৪৬
১৩	৩০	আল-বালাদ	৯০

পূর্বেও বলা হয়েছে যে মাক্কী সূরাগুলোর নাযিলের সঠিক সময় হিসাব করা খুবই কঠিন। যেসব সূরা সম্পর্কে স্পষ্ট রেওয়ায়াত পাওয়া যায় না সেগুলোর ভাষা ও বাচনভংগী এবং আলোচ্য বিষয়বস্তুর ভিত্তিতেই সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। তাই মাক্কী সূরাগুলোকে উপরোক্ত চারটি স্তরে যেভাবে সাজানো হয়েছে তা একেবারে নির্ভুল বলে দাবী করার উপায় নেই। তবু এ স্তর বিন্যাস সূরাগুলোর বক্তব্য বুঝতে সাহায্য করবে বলেই আশা করা যায়। আর সেটাই এ শ্রেণীবিন্যাসের আসল উদ্দেশ্য।

১৬. মাক্কী ও মাদানী সূরার সংখ্যা ভিত্তিক হিসাব

কুরআন মজীদের ১১৪টি সূরার ক্রমিক সংখ্যার ভিত্তিতে মাক্কী যুগের ৮৯টি ও মাদানী যুগের ২৫টি সূরার হিসাব নিম্নে দেয়া হলো ঃ

মাক্কী যুগের সূরা	সংখ্যা	মাদানী যুগের সূরা	সংখ্যা
১নং	১	২-৫নং	৪
৬ ও ৭নং	২	৮ ও ৯নং	২
১০-২১নং	১২	২২ ও ২৪নং	২
২৩নং	১	৩৩নং	১
২৫-৩২নং	৮	৪৭-৪৯নং	৩
৩৪-৪৬নং	১৩	৫৭-৬৬নং	১০
৫০-৫৪নং	৫	৯৮নং	১
৫৫ ও ৫৬নং	২	১০৭নং	১
৬৭-৯৭নং	৩১	১১০নং	১
৯৯-১০৬নং	৮		
১০৮ ও ১০৯নং	২		
১১১-১১৪নং	৪		
মোট	৮৯	মোট	২৫

১৭. কুরআনের আলোচ্য বিষয়

ক) কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয় ঃ

মানুষের কল্যাণ ও অকল্যাণের সঠিক পথনির্দেশ ঃ

এ কেন্দ্রীয় বিষয়কে নেতিবাচক ও ইতিবাচক বিষয়ে ভাগ করা যায়। গোটা কুরআনে একদিকে মানুষকে ভুল পথ সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে ; অপরদিকে সঠিক পথের সন্ধান দেয়া হয়েছে ঃ

খ) নেতিবাচক বিষয় ঃ

১. বলিষ্ঠ যুক্তি দিয়ে বুঝানো হয়েছে যে নির্ভুল জ্ঞানের অভাবেই মানুষ জীবনের সঠিক উদ্দেশ্য বুঝতে পারে না।

২. স্থুল দৃষ্টি, অমূলক ধারণা ও প্রচলিত কুসংস্কারের দরুন মানুষ বিশ্বের স্রষ্টা ও বিশ্বজগত সম্পর্কে এমনসব মতবাদ রচনা করেছে যা মানব জীবনে অশান্তিই বৃদ্ধি করে চলেছে।

৩. বিবেকের দাবী ও নৈতিকতার বন্ধন অগ্রাহ্য করে প্রবৃত্তির দাসত্ব ও ভোগবাদী মনোবৃত্তির দরুন মানুষ নিজের সত্তার সঠিক পরিচয় সম্পর্কেও সচেতন নয়।

৪. উপরোক্ত কারণে জগত ও জীবন সম্পর্কে বহু অযৌক্তিক ধারণার ভিত্তিতে মানুষ ভ্রান্ত আচরণ ও মন্দ কর্মে লিপ্ত রয়েছে।

৫. মানবজাতির অতীত ইতিহাস থেকে উদাহরণ দিয়ে প্রমাণ করা হয়েছে যে, আল্লাহর বিধানকে অগ্রাহ্য করে মনগড়া মত ও পথে চলার ফলেই মানুষ যুগে যুগে ধ্বংস হয়েছে।

গ) ইতিবাচক দিক দিয়ে আলোচনার ধারা নিম্নরূপ ঃ

১. নির্ভুল জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর নিকটই আছে। মানুষ ও বিশ্বজগত যিনি সৃষ্টি করেছেন তাঁর কাছ থেকেই বিশুদ্ধ জ্ঞান পাওয়া সম্ভব।

২. অতীত ও ভবিষ্যতের জ্ঞান যে আল্লাহর নিকট চির বর্তমান তিনিই মানুষকে সঠিক পথ দেখাতে সক্ষম।

৩. মানুষকে দুনিয়ায় সঠিকভাবে জীবন-যাপন করে আখিরাতে চির শান্তি লাভ করার একমাত্র উপায়ই হলো আল্লাহর রাসূলগণকে পূর্ণরূপে অনুসরণ করা।

৪. মানুষের চিন্তা ও কর্মের জন্য একমাত্র নির্ভরযোগ্য পথনির্দেশকই হলো দ্বীন ইসলাম।

৫. দুনিয়ার শান্তি ও আখিরাতের মুক্তি পেতে হলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যই একমাত্র উপায়।

ঘ) উপরোক্ত কেন্দ্রীয় বক্তব্যকে সুস্পষ্ট করার উদ্দেশ্যে যেসব বিষয় কুরআনে আলোচনা করা হয়েছে, তার মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঃ

১. পৃথিবী ও আকাশ রাজ্যের গঠন-প্রকৃতি, প্রাকৃতিক অগণিত নিদর্শন এবং চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-তারা এবং বায়ু ও বৃষ্টি ইত্যাদির প্রতি বারবার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। ভূগোল ও বিজ্ঞান শেখাবার উদ্দেশ্যে এসব আলোচনা করা হয়নি। এসবের পেছনে যে মহাকুশলী স্রষ্টা রয়েছেন এবং তিনি যে এসব বিনা উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেননি সে কথা বুঝাবার জন্যই অতি আকর্ষণীয় ভাষা ও ভঙ্গিতে সমস্ত কুরআনে এ বিষয়ে বারবার আলোচনা করা হয়েছে।

২. মানুষের প্রয়োজনে আল্লাহ পাক যত কিছু পয়দা করেছেন—বিশেষ করে খাদ্য ও পানীয়, গৃহপালিত পশু, ফল ও ফসলাদী সম্পর্কে বারবার উল্লেখ করে চিন্তা করতে বাধ্য করা হয়েছে যে, আল্লাহ ছাড়া আর কারো পক্ষে এসবের ব্যবস্থা করা সম্ভব নয় এবং এসব ছাড়া মানুষ দুনিয়ায় একদিনও বেঁচে থাকতে পারতো না। তাই একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব করাই মানুষের কর্তব্য।

উপরোক্ত দু প্রকার বিষয়কে এক সাথে 'আফাক' বা প্রকৃতি জগত বলা হয়। গোটা সৃষ্টিজগতই এর অন্তর্ভুক্ত। 'উফুক' এর বহুবচন আফাক। উফুক অর্থ দিগন্ত (Horizon)।

৩. "আফাক"-এর আলোচনার পাশাপাশি 'আনফুস'-এর আলোচনা করা হয়েছে 'আনফুস' অর্থ মানব জীবন বা মানবসত্তা। আল্লাহ পাক কুরআনে বহু জায়গায় মানুষকে কিভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে এর বিবরণ দিয়েছেন। মানুষের দেহ ও বিভিন্ন অংগপ্রত্যঙ্গ নিয়ে যথেষ্ট কথা বলা হয়েছে। মানুষকে আত্মসচেতন করার উদ্দেশ্যেই এবং তার স্রষ্টাকে

চিনে তার প্রতি কৃতজ্ঞ বানাবার উদ্দেশ্যেই এ বিষয়ের দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

৪. মানব জাতির ইতিহাস থেকে বহু জাতির উত্থান ও পতন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ আলোচনা এমনভাবে করা হয়নি যেমন ইতিহাসের বইতে করা হয়। অতীত জাতিগুলো থেকে উপদেশ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যেই এ আলোচনা করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বিশেষ করে অতীতে যেসব নবী ও রাসূল পাঠানো হয়েছে তাদের কাওমের উল্লেখ করে প্রমাণ করা হয়েছে যে, আল্লাহর রাসূলগণের সাথে যারা যে আচরণ করেছে তাদের সাথে আল্লাহ সে রকম ব্যবহারই করেছেন। যেসব জাতি রাসূলগণকে অস্বীকার করেছে তাদের উপর আল্লাহ অবশ্যই গযব নাযিল করেছেন। মানব জাতির উন্নতি ও অবনতি যে রাসূলের আনুগত্যের উপর নির্ভর করে সে কথা প্রমাণ করাই ইতিহাস আলোচনার উদ্দেশ্য।

৫. কুরআনের বহু জায়গায় কতকগুলো বিষয়ে তুলনামূলক আলোচনা করে দু' রকম বিপরীত জিনিসের পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে আলোচনা করে দু' রকম বিপরীত জিনিসের পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। যেখানেই বেহেশতের বিবরণ দেয়া হয়েছে সেখানেই দোযখের চিত্রও আঁকা হয়েছে। সৎলোকের গুণাবলী বর্ণনা করার সাথে সাথেই অসৎলোকের বিবরণও দেয়া হয়েছে। মুত্তাকীদের বৈশিষ্ট্যের পাশাপাশি আল্লাহর নাফরমানদের চরিত্রও ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। সফলতা লাভের উপায় বলার সাথে বিফলতার কারণও উল্লেখ করা হয়েছে। বেহেশতের সুখের আকর্ষণীয় বিবরণের পাশে দোযখের ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। হাশরে নেক লোকদের অবস্থার পাশে বদলোকদের দশাও বর্ণনা করা হয়েছে। এভাবে কুরআনে বিপরীতমুখী, (Contrast) চিত্রের মাধ্যমে মানুষকে কল্যাণের পথে আহ্বান জানানো হয়েছে।

৬) কুরআনের সবচেয়ে বেশী আলোচিত বিষয় ঃ

১. আল্লাহর পরিচয়–কয়েক আয়াতের পর পরই আল্লাহর কোন না কোন গুণের উল্লেখ পাওয়া যায়। কোথাও কোথাও এক সাথেই আল্লাহর অনেক গুণের উল্লেখ করা হয়েছে।

২. রাসূল ও নবীদের পরিচয়, মর্যাদা, দায়িত্ব ও কর্তব্য।

৩. আখিরাতের যুক্তি, সম্ভাবনা ও বিবরণ।

৪. আল্লাহর কিতাবের গুরুত্ব।

চ) মাদানী সূরাগুলোর বিশেষ আলোচ্য বিষয় ঃ

উপরে বর্ণিত আলোচ্য বিষয়সমূহ সমস্ত কুরআনেই ছড়িয়ে আছে। মাক্কী ও মাদানী–উভয় যুগের সূরার মধ্যেই ঐসব বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। যা মাক্কী যুগের সূরাতে পাওয়া যায়, সেগুলো নিম্নরূপ ঃ

১. মাদীনায় হিজরাত করার পরই সমাজ গঠন ও রাষ্ট্র পরিচালনার সুযোগ এলো। তাই পারিবারিক আইন থেকে শুরু করে সরকারী দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজনীয় সব আইন-কানুন মাদানী সূরাগুলোতেই পাওয়া যায়। এসব বিষয়ে মাক্কী যুগের শেষ দিকে সূরা বনী ইসরাইলে সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের ব্যাপারে এমন সংক্ষেপে ইঙ্গিত করা হয়েছে যা মূলনীতি হিসাবে গণ্য। কিন্তু বিস্তারিত আইন মাদানী যুগেই নাযিল হয়েছে।

২. মাক্কী যুগে মুসলমানদের উপর অত্যাচার ও নির্যাতন চললেও কাফির ও মুশরিকদের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগের কোন উপায় ছিল না। হিজরাতের পর মুসলমানদের হাতে ক্ষুদ্র আকারে হলেও রাষ্ট্রক্ষমতা আসার পরই বিরোধী শক্তির সাথে যুদ্ধ করার সুযোগ হলো। তাই যুদ্ধ, সন্ধি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, যুদ্ধবন্দীদের সাথে আচরণ, যুদ্ধের ফলে অর্জিত সম্পদ ও এলাকার ব্যবহার, যুদ্ধে শহীদদের পরিবারের প্রতি কর্তব্য ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আইন মাদানী সূরায়ই পাওয়া যায়।

৩. মাদানী সূরায় যেসব বিষয়ে বিস্তারিত বিধি বিধান দেয়া হয়েছে তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো ঃ বিয়ে ও তালাক, সম্পত্তির উত্তরাধিকার, খাদ্যের হালাল ও হারাম এবং ফৌজদারী আইন (সমাজবিরোধী কোন্ কাজের কী শাস্তি হওয়া উচিত), সামাজিক নিরাপত্তার জন্য যাকাত ব্যবস্থার প্রবর্তন, ধার-কর্য ও লেন-দেনের বিধান ইত্যাদি।

৪. যেসব বিষয়ে মূলনীতি বেঁধে দেয়া হয়েছে এবং এর ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় আইন রচনার দায়িত্ব ইসলামী রাষ্ট্রের পরিচালকদের হাতে ছেড়ে দেযা হয়েছে ঃ

সরকার গঠন ও পরিচালনার মূলনীতি, অর্থনৈতিক পলিসী, উৎপাদন ও বণ্টনের নীতি, ব্যবসা-বাণিজ্যের বিধি ইত্যাদি বিষয়ে 'গাইড-লাইন' দিয়ে দেয়া হয়েছে। ঐসব মূলনীতির ভিত্তিতেই রাসূল (সাঃ) বিস্তারিত বিধান চালু করেন।

আল্লাহর কুরআন ও রাসূল (সাঃ)-এর সুন্নাহ এসব বিষয়ে যে বিধান দিয়েছে তারই ভিত্তিতে খোলাফায়ে রাশেদীন আরও বিস্তারিত আইন জারী করেন।

এ বিষয়গুলো এমন যে, যুগে যুগে নতুন নতুন বিধি-বিধানের দরকার বোধ না হয়ে পারে না। কুরআনের মূলনীতি, সুন্নাহর প্রয়োগ বিধি ও খোলাফায়ে রাশেদার পদাংক অনুসরণ করে দেশে দেশে যুগে যুগে প্রয়োজনীয় বিধান রচনা করতে হবে।

৫. বিশেষ বিবেচনার বিষয় ঃ এখানে একটি কথা গভীরভাবে চিন্তা ও বিবেচনা করা প্রয়োজন। যেসব বিষয়ে মাদানী যুগের সূরাগুলোতে মূলনীতি ও বিস্তারিত আইন নাযিল করা হয়েছে সেসব মাক্কী সূরায় কেন নাযিল করা হয়নি ? এ প্রশ্নটি কুরআন বুঝার সাথে জড়িত।

যদি মাক্কী যুগে এসব আইন নাযিল করা হতো তাহলে মুসলমানরা এসব আয়াত শুধু তেলাওয়াতই করতে পারতেন। মক্কায় এসব আইন জারী করার সুযোগ ছিল না। আইন জারী করার ক্ষমতা মুসলমানদের হাতে তুলে দেবার পরই আল্লাহ্ পাক তাদের নিকট আইন পাঠালেন, যাতে এসব আইন শুধু তেলাওয়াত করেই ক্ষান্ত হতে না হয়। এ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর আইন শুধু তেলাওয়াতের জন্য নাযিল করা হয়নি। তাই সমাজ ও রাষ্ট্রের এসব আইন চালু করার দায়িত্ববোধ নিয়ে কুরআনকে বুঝতে হবে। তা না হলে কুরআন বুঝবার হক আদায় হতে পারে না।

১৮. কুরআনের আলোচনা কৌশল

মাদানী যুগের সূরাগুলোর আলোচ্য বিষয় এমন যে তা বুঝতে এতটা অসুবিধা মনে হয় না। কিন্তু মাক্কী যুগের সূরার আসল বক্তব্য বুঝতে সে

তুলনায় বেশ কঠিন বোধ হয়। অবশ্য কুরআনের আলোচনার টেকনিক ধরতে পারলে সহজেই বুঝতে পারা যায়।

ক) প্রথমেই মনে রাখতে হবে মাক্কী যুগের সূরাগুলোর মূল আলোচ্য বিষয় হলো তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত। কোন সূরায় এ তিনটির একটি, কোনটায় যে কোন দুটো এবং কোনটায় তিনটিই আলোচনা করা হয়েছে। আবার দেখা যাবে যে কোন সূরায় একটা বিষয় প্রত্যক্ষ এবং অন্য একটা বা দুটো পরোক্ষভাবে এসেছে।

খ) মূল আলোচ্য বিষয়কে ভালভাবে বুঝবার জন্য 'আফাক' ও 'আনফুস'কে যুক্তি হিসাবে পেশ করা হয়েছে। এখানে আফাক ও আনফুসের বিবরণটা আসল কথা নয়। আসল বিষয় হলো তাওহীদ বা রিসালাত বা আখিরাত। একথা খেয়াল না থাকলে আসল শিক্ষা থেকে বঞ্চিত থাকতে হবে।

গ) তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের শিক্ষাকে বাস্তবে উপলব্ধি করার জন্য নবী ও রাসূলগণের বহু ঘটনা, বিভিন্ন জাতির উদাহরণ ও রূপক কাহিনী আলোচনা করা হয়েছে। এসবের মূল শিক্ষা যে তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত, সে কথার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ না রাখলে ঐসব ঘটনা ও কাহিনীই আসল বিষয় বলে গণ্য হবার আশংকা রয়েছে।

'ইসরাঈলিয়াত' নামে পরিচিত বিস্তারিত কাহিনী ইয়াহুদীদের ইতিহাস থেকে আমদানী হয়ে কুরআনে উল্লেখিত ঘটনাবলী ও কাহিনীসমূহকে রূপকথার এমন গল্পে পরিণত করেছে যে, তাফসীর পড়তে গিয়ে পাঠক ঐ গল্পের মধ্যেই আটক হয়ে পড়ে। তখন তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের যুক্তি হিসাবেই যে ঐ ঘটনাগুলো উল্লেখ করা হয়েছে সে উদ্দেশ্য ও শিক্ষাই হারিয়ে যায়।

ঘ) মূল আলোচ্য বিষয় নির্ধারণ ঃ সুতরাং প্রত্যেক সূরা অধ্যয়নকালে পয়লা তালাশ করতে হবে যে, সূরাটির মূল আলোচ্য বিষয় কী ? যেমন সূরা মুলক (৬৭নং সূরা)। এর মূল আলোচ্য বিষয় তাওহীদ। সূরা মুদ্দাসসির (৭৪) ও আবাসা (৮০) এর মূল আলোচ্য বিষয় হলো রিসালাত। সূরা কাফ (৫০), সূরা যারিয়াত (৫১), সূরা মায়ারিজ (৭০) ও সূরা মুতাফফিফীন (৮৩) এর প্রধান আলোচ্য

বিষয় আখিরাত। সূরা তূর (৫২) ও সূরা হাক্কাহ (৬৯) এর প্রথম রুকূ'তে আখিরাত ও ২য় রুকূ'তে রিসালাত হলো মূল বিষয়।

এভাবে মূল বিষয় তালাশ করার পর দেখা যাবে যে, প্রত্যেক বিষয়ের পক্ষে বিভিন্ন রকম যুক্তি পেশ করা হয়েছে। ঐ যুক্তিগুলোর ধরন বুঝ তে হবে। তাহলে যুক্তিগুলোর ভিত্তিতে মূল বিষয়কে বুঝা সহজ হবে। তাই তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের যুক্তির ধরন সম্পর্কে ভালভাবে অবগত হওয়া দরকার।

এক ঃ তাওহীদের পক্ষে যুক্তি

যে সূরা বা রুকূ'র মূল আলোচ্য বিষয় তাওহীদ সে সূরার পক্ষে তিন ধরনের যুক্তির যে কোন এক বা একাধিক যুক্তি পাওয়া যায়।

প্রথমতঃ আফাকী যুক্তি ঃ পৃথিবীর সমস্ত সৃষ্ট বস্তু যা মানুষের উপকারে লাগে এবং মহাশূন্যের বিরাট বিরাট সৃষ্টি যা মানুষের খেদমতে নিযুক্ত, এসবকে তাওহীদের যুক্তি হিসাবে পেশ করে দেখানো হয়েছে যে, গোটা বিশ্ব একজন মহাকৌশলীর একক পরিকল্পনায়ই এমন সুশৃংখলভাবে এবং এক নিয়মে চলছে। এ মহাপরিকল্পনায় ও বিশ্বের পরিচালনায় এবং মানবজাতির প্রয়োজনে যাকিছু সৃষ্টি করা হচ্ছে এর মধ্যে আল্লাহর সাথে আর কেউ শরীক নেই। সমগ্র সৃষ্টির ব্যবস্থাপনা আল্লাহর একক ইচ্ছা ও ক্ষমতার অধীন। আর কারো ইখতিয়ার সেখানে খাটে না।

দ্বিতীয়তঃ 'আনফুস'-এর যুক্তি ঃ মানব সৃষ্টির কৌশল—মাটি থেকে পয়লা আদমকে সৃষ্টি করে তা থেকে হাওয়াকে পয়দা করা হয় এবং এর পর তাদের যৌন মিলনের মাধ্যমে আল্লাহরই ইচ্ছায় মানব বংশের বৃদ্ধি হচ্ছে। পুরুষের সামান্য শুক্রকীট নারীর গর্ভস্থ ডিম্বের সাথে মিলে যে অণু পরিমাণ ক্ষুদ্র সৃষ্টির পত্তন হয় তা একমাত্র আল্লাহরই পরিকল্পনায় সুন্দর দেহ ও অগণিত গুণ বিশিষ্ট মানুষে পরিণত হয়।

মানুষের প্রতিটি অংগপ্রত্যঙ্গ প্রমাণ করে যে, মানব দেহের এ সুনিপুণ বিন্যাস ও তার মন মস্তিষ্কের এমন বিকাশের কৃতিত্ব একমাত্র আল্লাহর। এতে মানুষের বাহাদুরী করার কিছুই নেই। আল্লাহ যাকে পুরুষ বানাতে চান তাকে মেয়ে বানাবার ক্ষমতা কারো নেই। মায়ের পেটে তিনি যাকে একটা হাত দেননি তাকে এ হাত কেউ দিতে পারে না। যাকে তিনি বোকা বানিয়েছেন তাকে কেউ মেধাশক্তি দিতে পারে না। এসব যুক্তি

দিয়ে বুঝানো হয়েছে যে, এসব কিছুর ক্ষমতা এককভাবে একমাত্র আল্লাহর হাতে রয়েছে। কেউ তাঁর সাথে শরীক নেই।

তৃতীয়তঃ তাওহীদ বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদের পরিণাম বর্ণনা করা হয়েছে যাতে মানুষ তাওহীদ বিশ্বাস করার গুরুত্ব অনুভব করতে পারে। এ পরিণাম দু' প্রকারে দেখানো হয়েছে।

ক) ঐতিহাসিক যুক্তি—তাওহীদ অবিশ্বাসী জাতির উপর অতীতে আল্লাহ কিভাবে আযাব নাযিল করেছেন তার উদাহরণ দেয়া হয়েছে।

খ) আখিরাতের ভয়াবহ পরিণামের যুক্তি—তাওহীদ অবিশ্বাসীগণকে আল্লাহ পাক আখিরাতে কেমন শাস্তি দেবেন এবং বিশ্ববাসীদেরকে কিভাবে পুরস্কৃত করবেন তার বিবরণ দিয়ে তাওহীদকে কবুল করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে এবং শিরক থেকে সাবধান করা হয়েছে।

দুই ঃ রিসালাতের পক্ষে যুক্তি

যে সূরা বা রুকূ'র মূল আলোচ্য বিষয় 'রিসালাত' সেখানেও তিন রকম যুক্তির এক বা একাধিক যুক্তি পাওয়া যায় ঃ

প্রথমতঃ রাসূল (সাঃ)-এর উন্নত নির্মল চরিত্রকে প্রমাণ হিসাবে পেশ করে বলা হয়েছে যে, মুহাম্মাদ (সাঃ) অবশ্যই আল্লাহর রাসূল। তাঁর অতীত জীবনে, তাঁর মানবিক গুণাবলী এবং তাঁর সংস্পর্শে যারা এসেছেন তাদের নৈতিক ও মানসিক উন্নতি একথাই প্রমাণ করে যে তাঁর নবুওয়াতের দাবী খুবই যুক্তিসঙ্গত।

দ্বিতীয়তঃ রাসূল (সাঃ)-এর উপর আল্লাহর যে কিতাব নাযিল হয়েছে সে কুরআনকেও যুক্তি প্রমাণ হিসাবে পেশ করা হয়েছে। কুরআনের ভাষা ও ভাব এমন যে কোন মানুষের পক্ষে তা রচনা করা সম্ভব নয়। এ বিষয়ে কুরআন কাফিরদের চ্যালেঞ্জও দিয়েছে। এর মহান উপদেশ, নির্ভুল বিধান ও যুক্তিপূর্ণ আহ্বান একথাই প্রমাণ করে যে মুহাম্মাদ (সাঃ) আল্লাহর রাসূল। তা না হলে কুরআন তিনি কী করে পেলেন ?

তৃতীয়তঃ রাসূলকে অবিশ্বাস করার ভয়াবহ পরিণাম বর্ণনা করে এ বিষয়ে মানুষকে উপদেশ দেয়া হয়েছে। এর পরিণামও দু' প্রকারের দেখানো হয়েছে ঃ

ক) ইতিহাসের উদাহরণ—নূহ (আঃ), শোয়াইব (আঃ), লূত (আঃ), হুদ (আঃ), সালেহ (আঃ) ও অন্যান্য নবীদের কাওমের উপর দুনিয়াতেই আযাব নাযিল হয়েছে। এসবের বিবরণ কুরআনে বার বার উল্লেখ করা হয়েছে।

খ) আখিরাতের পরিণাম এমনভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যা থেকে বুঝা যায় যে, সেখানে মানুষের কিসমতের ফায়সালা এই ভিত্তিতে হবে যে, কে রাসূলকে বিশ্বাস করেছে আর কে করেনি।

তিন ঃ আখিরাতের পক্ষে যুক্তি

যে সূরা বা রুকূ'র মূল আলোচ্য বিষয় আখিরাত সেখানেও তিন ধরনের যুক্তির মধ্যে এক বা একাধিক যুক্তি পেশ করা হয়েছে ঃ

প্রথমতঃ ইমকান (امكان) বা সম্ভাবনা—আখিরাত হওয়া যে সম্ভব তা প্রমাণ করা হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ উকূ' (وقوع) বা আখিরাত অবশ্যই যে হবে বা হবেই হবে সে বিষয়ে বিবরণ।

তৃতীয়তঃ উজূব (وجوب) বা হওয়াই উচিত—অর্থাৎ যুক্তি, বিবেক ও কাণ্ডজ্ঞানের দাবী যে আখিরাত হওয়া অপরিহার্য।

এ তিন ধরনের যুক্তিগুলোর আরও একটু ব্যাখ্যা দরকার—

প্রথমতঃ ইমকান বা সম্ভাবনা সম্পর্কে যেসব যুক্তি প্রমাণ দেয়া হয়েছে তা দু' প্রকার–আফাক ও আনফুস। আফাক মানে সৃষ্টিজগতের বহু উদাহরণ দিয়ে—বিশেষ করে বৃষ্টির পানি দ্বারা মৃত যমীনকে জীবিত করার উদাহরণ বারবার দিয়ে প্রমাণ করা হয়েছে যে, আখিরাতে আবার মানুষকে পয়দা করা সম্ভব। আর আনফুস মানে মানুষের দেহের অংগ-প্রত্যঙ্গ ইত্যাদির উদাহরণ দিয়ে বলা হয়েছে যে, একবার যিনি এসব সৃষ্টি করেছেন তাঁর পক্ষে আবার সৃষ্টি করা অসম্ভব হবে কেন ?

দ্বিতীয়তঃ উকূ' (وقوع) অর্থাৎ হবেই হবে। কুরআনে এ বিষয়ে এমনভাবে কথা বলা হয়েছে যে, আখিরাত হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ করার উপায় নেই। আখিরাতের কয়েকটি পর্যায় রয়েছে। প্রথম পর্যায় হলো কিয়ামত। দুনিয়া যে অবস্থায় আছে তা এক সময় ভেঙে চুরমার করে

দেয়া হবে। এরই নাম কিয়ামাত। পুনরুত্থানের পূর্ব পর্যন্ত সময়ের নাম হলো বারযাখ। এরপর হলো বা'স (بعث) বা পুনরায় সৃষ্টি হওয়া। এরপর হাশর ও বিচার।

কুরআনের বিভিন্ন সূরায় কিয়ামাত ও হাশরের এমন জীবন্ত বিবরণ দেয়া হয়েছে যা প্রমাণ করে যে এসব অবশ্যই হবে। বহু জায়গায় অতীত কালের ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে যাতে বুঝা যায় যে, আখিরাত আল্লাহর হিসাবে ভবিষ্যতের সম্ভাবনার বিষয় নয়, যেন অতীত ঘটনার মতো সত্য।

তৃতীয়তঃ উজূব (وجـــــوب) মানে হওয়াই যুক্তিসংগত, অবশ্য কর্তব্য, অপরিহার্য এবং যা না হলে চলে না।

এ প্রসঙ্গে কুরআনে তিন রকমের যুক্তি দেয়া হয়েছে ঃ

ক) ইতিহাসের প্রমাণ–বহু জাতির উত্থান-পতনের উদাহরণ দিয়ে প্রমাণ করা হয়েছে যে, দুনিয়াটা বস্তুজগত হলেও চূড়ান্ত পর্যায়ে গোটা মানবজাতি আল্লাহর তৈরী নৈতিক বিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। নৈতিক এমন এক মানদণ্ড দ্বারা আল্লাহ মানব জাতিকে নিয়ন্ত্রিত করেন যে কোন জাতি এর শেষ সীমা লংঘন করলে তিনি সে জাতির উপর অবশ্যই গযব নাযিল করেন।

খ) আল্লাহ পাক যুক্তি দিয়ে বুঝিয়েছেন যে, দুনিয়ার জীবনে মানুষকে চিন্তা ও কর্মে যে ইখতিয়ার বা স্বাধীনতা দিয়েছেন তার দরুন তিনি মন্দ কাজ করার সাথে সাথেই মানুষকে শাস্তি দেন না। দুনিয়ায় দেখা যায় যে, চরম অন্যায় করেও মানুষ বেশ সুখেই আছে। আবার অত্যন্ত সৎলোকও জীবনে কেবল দুঃখই পায়।

কুরআনে যুক্তি দেয়া হয়েছে যে, এ দুনিয়ায় ভাল ও মন্দ কাজের বস্তুগত ফলই শুধু প্রকাশ পায়, নৈতিক ফল প্রকাশ পায় না। এভাবেই মানুষকে দুনিয়ায় পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে।

কুরআনে বার বার উল্লেখ করা হয়েছে যে, মানুষকে এত সুযোগ সুবিধা দেবার সাথে সাথে ভাল ও মন্দের ধারণাও দেয়া হয়েছে। একদিন এসবের হিসাব দিতেই হবে। তাই নৈতিক ফল প্রকাশ করার জন্য আখিরাত অপরিহার্য।

গ) আরও এক রকম যুক্তি দ্বারা একথা বুঝানো হয়েছে যে, মানুষ নৈতিক বিধানকে অবশ্যই স্বীকার করে থাকে। ভালকে ভাল বলা এবং মন্দকে মন্দ মনে করার মতো বিবেক শক্তি মানুষকে দেয়া হয়েছে। তাই মানুষের বিবেকেরই দাবী যে, ভাল কাজের ভাল ফল ও মন্দ কাজের মন্দ ফল হওয়া উচিত। সূরা কিয়ামাহ (৭৫নং)-এর দ্বিতীয় আয়াতে নাফসে লাওয়ামাহ্ বা বিবেকের কসম খেয়ে আল্লাহ্ বলেছেন যে, আখিরাত হওয়া অবশ্যই উচিত।

মানুষ যদি ভাল কাজের পুরস্কার ও মন্দ কাজের শাস্তিকে যুক্তিসংগত মনে না করতো তাহলে মানব জীবন অচল হতো। আইন, বিচার ও জেলের অস্তিত্বই প্রমাণ করে যে, মানুষ নৈতিক জীবন এবং নৈতিক বিধান দ্বারা পরিচালিত। তাহলে বিবেক, বুদ্ধি ও যুক্তিরই দাবী যে, আখিরাত হওয়া জরুরী। কুরআনে বহু জায়গায় প্রশ্ন তোলা হয়েছে যে, নেক ও বদ লোকের পরিণাম কী করে এক রকম হতে পারে?

১৯. আন্দোলনের দৃষ্টিতে অধ্যয়ন

যেহেতু শেষ নবী (সাঃ)-এর নেতৃত্বে পরিচালিত ইসলামী আন্দোলনকে ধাপে ধাপে বিজয়ের পথে এগিয়ে নেবার উদ্দেশ্যেই কুরআন নাযিল হয়েছে, সেহেতু এর অধ্যয়ন আন্দোলনের দৃষ্টিতেই হওয়া উচিত। তবেই কুরআনের মর্মকথা বুঝা সহজ হবে।

অধ্যয়নকালে একথা খেয়াল রাখতে হবে যে, দ্বীনে হকের আন্দোলন ময়দানে চলছে এবং বাতিল শক্তি এর বিরোধিতা করছে। হক ও বাতিলের এ সংঘর্ষে হকের সহায়তা করার জন্যই কুরআনের আগমন।

যে অংশ পড়া হচ্ছে তা আন্দোলনের কোন্ যুগে কোন্ অবস্থায় নাযিল হয়েছে এবং ঐ সময় হকের আন্দোলন কোন্ অবস্থায় ছিল ও বাতিলের ভূমিকা কী ছিল তা মনের চোখে দেখতে হবে, এটাই হল আসল শানে নুযূল।

অধ্যয়নকারী যদি ইসলামী আন্দোলনে সক্রিয় না হন তাহলে তার মন আন্দোলন নিরপেক্ষ থাকার দরুন কুরআনের মর্মবাণী পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে পারবে না। হক ও বাতিলের এ সংঘর্ষে কুরআনের পাঠক নিজকে কোন্ পক্ষে মনে করেন সে কথা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদি তিনি হকের

পক্ষে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন তাহলে তার মনে হবে যেন তাকে বর্তমান পরিস্থিতিতে সঠিক পথ দেখাবার জন্যই কুরআন নাযিল হয়েছে।

কুরআনের বেশীর ভাগ আয়াতই এমন যে তা একদিকে হকপন্থীদেরকে উপদেশ ও সাহস দেয় এবং অপরদিকে বাতিলকে দমন করার জন্য সাবধানবাণী শুনায়। এ যেন দুধারী তলোয়ার–উভয় দিকেই কাটে। একই আয়াতে উভয় পক্ষের বক্তব্য রয়েছে। পাঠক কোন্ পক্ষে আছেন সে অনুযায়ীই বুঝবার সুযোগ হবে। আন্দোলনে সক্রিয় হলে বক্তব্য সরাসরি বুঝে আসবে।

২০. মাক্কী যুগের সূরা অধ্যয়নের টেকনিক (পদ্ধতি বা কৌশল)

ক) সর্বপ্রথম একথা জানবার চেষ্টা করতে হবে যে, আলোচ্য সূরাটি কখন নাযিল হয়েছে। মাক্কী যুগের যে স্তরে সূরাটি নাযিল হয়েছে সে যুগে রাসূল (সাঃ)-এর নেতৃত্বে পরিচালিত আন্দোলনের অবস্থা কী ছিল এবং কাফির ও মুশরিকরা কী ধরনের বিরোধিতা করছিল সে চিত্রটি মনের চোখে দেখতে হবে।

খ) তারপর সূরাটির কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয় নির্ণয় করতে হবে। সূরাটি একটু বড় হলে আলোচ্য বিষয় একাধিক হতে পারে। তাওহীদ, রিসালাত বা আখিরাতের কোন একটা বা দুটো বা তিনটাই মূল আলোচ্য হতে পারে। সূরার কোন অংশের মূল বিষয় কী তা নির্দিষ্ট করাই প্রথম কর্তব্য।

গ) এরপর যে সূরার যে মূল আলোচ্য বিষয় বা সূরার যে অংশের যে মূল বিষয় জানা গেল তাকে কেন্দ্র করেই সূরার বা এর কোন রুকূ বা অংশের বাকী বক্তব্যকে বুঝতে চেষ্টা করতে হবে। কারণ আর সব কথা এ মূল বিষয়ের যুক্তি হিসাবেই দেয়া হয়েছে বলে মনে করতে হবে।

এমন কি কোন ঐতিহাসিক ঘটনা বা কোন রূপক কাহিনীও যদি থাকে তাও ঐ মূল আলোচ্য বিষয়ের পক্ষে যুক্তি হিসাবেই আনা হয়েছে বলে বুঝতে হবে।

যেমন সূরা কাহ্ফ (১৮নং)-এর মধ্যে গুহাবাসীদের যে ঘটনার বিবরণ দেয়া হয়েছে তাতে আখিরাত যে সম্ভব (امكان) তার প্রমাণ

দেয়াই উদ্দেশ্য। কিন্তু মানুষ আসল শিক্ষা বা উপদেশের দিকে খেয়াল না করে কাহিনীর অপ্রয়োজনীয় বিস্তারিত বিষয়ের চর্চায় লেগে যায়। তাই গুহায় আশ্রয় গ্রহণকারী কতজন ছিলেন এবং তারা কত বছর ঘুমন্ত অবস্থায় ছিলেন এসব অপ্রয়োজনীয় কথা বাদ দিয়ে আসল উপদেশের দিকে লক্ষ্য করার তাকিদ সেখানে দেয়া হয়েছে।

ঘ) সূরাটিকে ভালভাবে বুঝতে হলে আয়াতগুলোকে পয়েন্টের ভিত্তিতে ভাগ করে নিতে হবে। কয়েকটি আয়াত মিলে একটি কথা স্পষ্ট হতে পারে। আবার অনেক ক'টি আয়াত একটি পয়েন্টে শামিল হতে পারে। কোন সময় একটি আয়াতের বক্তব্য একটা পৃথক পয়েন্টও হতে পারে। যেমন আমপারার সূরা নাবা (৭৮নং)-এর ১-৩ আয়াতে এক পয়েন্ট, ৪ ও ৫ আয়াতে আর এক পয়েন্ট এবং ৬-১৬ আয়াতে অন্য আর একটি মাত্র পয়েন্ট বা বক্তব্য পেশ করা হয়েছে।

যত পয়েন্টেই সূরাটি ভাগ করা হোক সব পয়েন্টের বক্তব্যকেই সূরাটির কেন্দ্রীয় বা মূল আলোচ্য বিষয়ের সাথে মিল করে বুঝতে হবে। তাহলে সূরাটির গোটা আলোচনা পাঠকের মনে ভালভাবে হজম হবে।

আমি এ পদ্ধতিতেই আমপারার সূরাগুলো আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। এ পদ্ধতিটি মাওলানা মওদূদী (রঃ)-এর 'তাফহীমুল কুরআন' নামক বিখ্যাত তাফসীরের বেশ কয়টি সূরার ভূমিকাকে অনুসরণ করেই তৈরী করেছি।

যারা কুরআনকে গভীরভাবে অধ্যয়নের চেষ্টা করেন এমন বন্ধু-বান্ধবদের সাথে এ প্রসংগে আলোচনার পর এ পদ্ধতিটি কুরআন বুঝ বার পক্ষে খুব সহায়ক বলেই মনে হয়েছে। এ পদ্ধতিতে একটি সূরাকে ভালভাবে বুঝতে পারার তৃপ্তিবোধ হয় বলে অনেকের মতামত পেয়ে এ বিষয়ে আমার প্রত্যয় আরও বেড়েছে।

২১. নবী কাহিনীর উদ্দেশ্য

কুরআনের বহু সূরায়, বিশেষ করে বড় বড় সূরাগুলোতে নবী-রাসূলগণের কাহিনী বার বার উল্লেখ করা হয়েছে। এ সম্পর্কিত আয়াতসমূহ কুরআনের বিরাট অংশ দখল করে আছে। গল্প বলা বা ইতিহাস চর্চা যে

এর আসল উদ্দেশ্য নয় তা না বুঝলে ঐসব কাহিনী ও ঘটনার খুঁটিনাটি আলোচনায়ই মানুষ মশগুল হয়ে পড়ে।

কুরআনে কোন নবীরই ধারাবাহিক ইতিহাস আলোচনা করা হয়নি। যেখানে যে মূল বক্তব্য উদ্দেশ্য তার পক্ষে ঐতিহাসিক যুক্তি পেশ করার জন্য যতটুকু ঘটনা দরকার ততটুকুই শুধু উল্লেখ করা হয়েছে। তাই একই নবীর কাহিনীর বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন সূরায় প্রয়োজন মত তুলে ধরা হয়েছে। একটি কাহিনী হিসাবে একই সূরায় একটানা কোন নবীর জীবনী আলোচনা করা হয়নি। হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর গোটা কাহিনী এক সূরায় আলোচনা করা হলেও তা মোটেই গল্পের আকারে পেশ করা হয়নি। নবীদের কাহিনী আলোচনার মূল উদ্দেশ্য কয়েকটি ঃ

ক) ঈমানদারদেরকে নবীদের উদাহরণ থেকে ধৈর্য, সাহস, দৃঢ়তা ও নিষ্ঠার শিক্ষা গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করা।

খ) নবীদের বিরোধিতা করার মারাত্মক পরিণাম উল্লেখ করে বাতিল শক্তিকে সাবধান করা।

গ) শেষ নবীর বিরোধিতায় যারা লিপ্ত ছিল তাদেরকে পূর্ববর্তী নবীদের বিরোধীদের পরিণাম থেকে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ দেয়া।

ঘ) যুগে যুগে যত নবী ও রাসূল এসেছেন তাঁদের সবাই যে একই দ্বীনের ধারক ছিলেন সে কথা প্রমাণ করা।

ঙ) হক ও বাতিলের সংঘর্ষ যে চিরন্তন সে কথা স্পষ্ট করে তুলে ধরা। যখনি কোন নবী দ্বীনে হক কায়েম করার চেষ্টা করেছেন তখনই বাতিল কায়েমী স্বার্থবাদী শক্তি বিরোধিতা করেছে।

চ) আল্লাহ পাক শক্তিবলে মানুষকে হেদায়াত করার ইখতিয়ার দেননি। মানুষকে শুধু বুঝাবার চেষ্টা করাই নবীদের দায়িত্ব ছিল।

ছ) মানুষ হককে কবুল করতে রাজী না হলে আল্লাহ জবরদস্তি করে কোন জাতিকে হেদায়াত করেন না। হককে কবুল করা ও না করা মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার উপরই নির্ভর করে।

২২. কুরআনের শিক্ষাকে জনগণের মধ্যে ব্যাপক করার উপায়

মুসলমানদের মধ্যে কুরআন তেলাওয়াতের রেওয়াজ বেশ আছে। এর অর্থ না জানলেও কাউকে কুরআন তেলাওয়াত করতে শুনলে তারা বুঝতে

পারে যে, কুরআন পড়া হচ্ছে। কুরআনের প্রতি ভক্তি থাকার ফলে তারা কুরআনের অর্থ শুনবার সুযোগ পেলে মন দিয়ে শুনে। কিন্তু সহজ ভাষায় কুরআনের বক্তব্য শুনবার সুযোগ তারা পায় না।

এ দেশের বহু জায়গায় দারসে কুরআন ও তাফসীর মাহফিল নামে কুরআন পাকের আলোচনা হয়। তাতে বিপুল সংখ্যায় মুসলমান জনসাধারণ উৎসাহের সাথে শরীক হয়। বছরে একবার জাঁকজমকের সাথে কয়েক দিন ধরেও এসব মাহফিল চলে। এতে কুরআন মজীদের প্রতি জনগণের আগ্রহ ও মহব্বতের পরিচয় পাওয়া যায়।

কুরআনের প্রতি এ শ্রদ্ধা ও আকর্ষণকে কাজে লাগিয়ে মসজিদে প্রতি সপ্তাহে একদিন করে হলেও 'দারসে কুরআন' চালু করা সহজ। কিছু সংখ্যক মসজিদে চালু আছে। কিন্তু দারস দেবার লোকের অভাবে অনেক মসজিদে চালু করা সম্ভব হয় না।

তাফসীর মাহফিলে যারা কুরআনের তাফসীর করেন তাঁরা ওলামায়ে কেরাম। আরবী ভাষায় তাঁদের জ্ঞান থাকার ফলে যোগ্যতার সাথে তাফসীর করতে পারেন। তারা আরবী, উর্দু ও বাংলায় অনেক তাফসীর পড়ার যোগ্যতাও রাখেন। কিন্তু তাঁরা বিস্তারিত তাফসীর করেন বলে কুরআনের অল্প কিছু অংশের শিক্ষাই পরিবেশন করার সময় পান।

তাফসীর মানে বিস্তারিত ব্যাখ্যা। ভাল আলেম ছাড়া তাফসীর করা সম্ভব নয়। আরবী বাক্য বিন্যাস না জানলে শব্দে শব্দে অর্থ বলে ব্যাখ্যা করা অসম্ভব। তাই যোগ্য লোকের অভাবে ব্যাপকভাবে তাফসীর মাহফিল সারা বছর চালু রাখার উপায় নেই। কিন্তু কুরআনের শিক্ষাকে জনগণের জন্য সহজলভ্য করতে না পারলে ইকামাতে দ্বীনের প্রচেষ্টা সফল হতে পারে না। এ মহান উদ্দেশ্যে 'দারসে কুরআন' এর ব্যবস্থা হওয়া উচিত। দারস মানে শিক্ষা। 'দারসে কুরআন' অর্থ হলো কুরআনের শিক্ষা। এ শিক্ষাকে জনগণের মধ্যে ব্যাপকভাবে চালু করতে হলে মসজিদে 'দারসে কুরআন' এর ব্যবস্থা থাকা দরকার। অন্ততঃ সপ্তাহে একদিন করে হলেও কুরআনের আলো যথেষ্ট ছড়ানো সম্ভব হবে।

কুরআন মজিদের মোট ১১৪টি সূরার মধ্যে সূরা ফাতিহার পর ৪৪টি সূরা কুরআনের ২৫টি পারা দখল করে আছে। আর ২৬ পারা থেকে ৩০ পারা পর্যন্ত মাত্র ৫টি পারায় ৬৯টি সূরা আছে। এ ৬৯-এর সাথে সূরা

ফাতিহা যোগ করলে মোট ৭০টি সূরা হয়। এ ৭০টির মধ্যে মাত্র ১৬টি মাদানী সূরা, আর ৫৪টি মাক্কী সূরা।

এ ৭০টি সূরা থেকেই নামাযে ইমামগণ বেশী বেশী পড়েন। তাছাড়া এর মধ্যে অধিকাংশই মাক্কী সূরা। কুরআন পাকের ১১৪টি সূরার মধ্যে ৮৯টি মাক্কী এবং এর মধ্যে ৫৪টি শেষ ৫ পারায় আছে। ইসলামী আন্দোলনের দৃষ্টিতে মাক্কী সূরাগুলো প্রথমে বুঝা বেশী দরকার।

সাপ্তাহিক 'দারসে কুরআন' চালু হলে এক থেকে দেড় বছরের মধ্যে এ ৭০টি সূরার শিক্ষা জনগণ পেতে পারে। এর মধ্যে ১৬টি মাদানী সূরা থাকায় সে সম্পর্কেও কিছু আলো তারা পেয়ে যাবে। মসজিদে সাপ্তাহিক দারসে কুরআন চালু করার কাজটির দায়িত্ব যদি ইমাম সাহেবগণ নেন তাহলে খুবই সহজে এ ব্যবস্থা জারী হতে পারে। তাঁরা একটু পরিশ্রম করলে দ্বীনের এক বিরাট কাজ হবে। কুরআন বুঝবার জন্য এ বইটিতে যা লেখা হয়েছে তা ইমামগণের এ কাজে সহায়ক হতে পারে।

কুরআন বুঝা ও বুঝানোতে অবশ্যই পার্থক্য আছে। বুঝবার জন্য আরবীর ভাষা জ্ঞান না হলেও কোন রকম চলতে পারে। কিন্তু আরবী ব্যাকরণের প্রাথমিক জ্ঞানটুকু ছাড়া বুঝাবার কাজ কঠিন। তবু যারা বুঝাবার কাজে আগ্রহ রাখেন তারা কোন আলেমের সাহায্যে নিম্নতম যোগ্যতা অর্জন করতে পারেন।

একটা মহাসত্য কথা সবাইকে স্বীকার করতে হবে যে, বুঝাবার চেষ্টা যারা করে তাদেরই বুঝাবার যোগ্যতা অর্জন করা সহজ হয়। যে অন্যকে বুঝাবার জন্য সময় ও শ্রম ব্যয় করে আল্লাহ পাক তাকেই ভালভাবে বুঝবার তাওফিক দান করেন। সে যদি কিছু ভুল করে তাহলে শ্রোতাদের মধ্য থেকে তার ভুল ধরার লোকও পাওয়া যাবে। এভাবে চর্চা চলতে থাকলে কুরআন বুঝবার লোকের সংখ্যা সমাজে বাড়তে থাকবে।

২৩. দারসে কুরআনের পদ্ধতি

দারসে কুরআনের দায়িত্ব যিনি নেবেন তাকে প্রথমেই দুটো কাজ করতে হবে ঃ

ক) প্রথমে তাকে কুরআন শুদ্ধ করে পড়তে হবে। তাজবীদের নিয়মে পুরোপুরি পড়তে না পারলেও মোটামুটি শুদ্ধ করে পড়তে সক্ষম হতে হবে।

খ) যদি তিনি আলেম না হয়ে থাকেন তাহলে কোন একজন আলেমের কাছে আরবীর প্রাথমিক ভাষাজ্ঞান শিখতে হবে।

দারসে কুরআন পেশ করার সময় নিম্নরূপ তারতীব অনুযায়ী একটার পর একটা করতে হবে ঃ

১. তেলাওয়াত—যে পরিমাণ আয়াত দারসে পেশ করা হবে তা পয়লা তেলাওয়াত করে শুনাতে হবে।

২. তরজমা—যথাসম্ভব সহজ ভাষায় আয়াতগুলোর অনুবাদ পেশ করতে হবে।

৩. শানে নুযূল বা পটভূমি—আলোচ্য আয়াতগুলোর নাযিলের সময় ও পরিবেশ আলোচনা করতে হবে।

৪. ব্যাখ্যা—আলোচ্য আয়াতগুলোর অর্থের বিস্তারিত আলোচনা করতে হবে।

৫. শিক্ষা—এ আয়াতগুলো থেকে কী কী বাস্তব শিক্ষা পাওয়া গেলো তা নির্ণয় করতে হবে। বর্তমান পরিবেশের সাথে মিলিয়ে কী কী উপদেশ পাওয়া গেলো তা তুলে ধরতে হবে।

২৪. কোন ধরনের মন কুরআনের মর্মার্থ ধরতে পারে ?

ক) শুধু কুরআনের তাফসীর ঘাটলেই এর মর্মকথা বুঝে আসে না। ইকামাতে দ্বীনের যে মহান আন্দোলনকে পথ দেখাবার জন্য কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে সে আন্দোলনে সক্রিয় হলে কুরআন বুঝবার জন্য পাঠকের মনের দুয়ার সঠিকভাবে খুলে যায়।

খ) যার নিকট কুরআন নাযিল হয়েছে সে মহামানবের দরদী মনের সাথে যে পাঠকের মন যতটা ঘনিষ্ঠ, কুরআনের মর্মার্থ সে ততটা গভীরভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে। মানব সমাজের সংশোধন ও শান্তির জন্য মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর মনে যে অস্থিরতা ও পেরেশানী ছিল

তার যতটা পাঠকের মনে সৃষ্টি হবে সে পরিমাণেই সে কুরআনকে বুঝতে পারবে।

গ) কুরআন অধ্যয়নের সময় মনে তীব্র অনুভূতি জাগাতে হবে যে, আমার মহান মনিব কুরআনের মাধ্যমে আমাকে উপদেশ দিচ্ছেন।

এ উপদেশ আমাকে মন-মগজ দিয়ে কবুল করতে হবে এবং নিজের জীবনে তা পালন করে চলতে হবে।

ঘ) মনে আকুল আকুতি নিয়ে মনিবের নিকট কুরআন বুঝবার শক্তি ও যোগ্যতা চাইতে হবে। দিল দিয়ে দোয়া করতে হবে।

ঙ) অন্তরে কুরআনের মর্যাদা, আযমত, গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে হবে। এ কিতাব যে দুনিয়ার আর সব কিতাবের মতো নয় তা খেয়াল করে মহব্বত ও ভক্তির সাথে পড়তে হবে।

২৫. কুরআনের পারা, রুকূ', আয়াত, শব্দ ও অক্ষর সংখ্যা

ক) গোটা কুরআন সমান ৩০টি পারায় বিভক্ত। হিজরী ৮৬ সালে এভাবে পারা, পারার অর্ধেক, এক-চতুর্থাংশ ইত্যাদি খণ্ডে ভাগ করা হয়েছে। এতে পাঠকদের পক্ষে হিসাব রাখা সহজ হয়েছে।

খ) মোট ১১৪টি সূরা।

গ) মোট ৫৪০টি রুকূ'।

ঘ) আয়াতের হিসাবে অনেক মতভেদ আছে। ৬০০০ থেকে ৬৬৬৬ পর্যন্ত বিভিন্ন মত আছে। এটা গণনার ধরনে পার্থক্যের ফল।

ঙ) ২৭৭৫টি আয়াতের পুনরাবৃত্তি আছে। শব্দ সংখ্যা ৭৭,২৭৭ বা ৭৭,৯৩৪। গণনার ধরনের পার্থক্যের কারণেই শব্দ সংখ্যার ব্যাপারেও মতভেদ হয়েছে।

চ) অক্ষর সংখ্যা ৩,৩৮,৬০৬

“ইকামাতে দ্বীনের যে মহান আন্দোলনকে পথ দেখাবার জন্য কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে সে আন্দোলনে সক্রিয় হলে কুরআন বুঝবার জন্য পাঠকের মনের দুয়ার সঠিকভাবে খুলে যায়।”

❐

“মানব সমাজের সংশোধন ও শান্তির জন্য মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর মনে যে অস্থিরতা ও পেরেশানী ছিল তার যতটা পাঠকের মনে সৃষ্টি হবে সে পরিমাণই কুরআন বুঝতে পারবে।”

❐

“মনে আকুল আকুতি নিয়ে মনিবের নিকট কুরআন বুঝবার শক্তি ও যোগ্যতা চাইতে হবে, দিল দিয়ে দোয়া করতে হবে।”

অধ্যাপক গোলাম আযমের রচিত বই তালিকা

কুরআন

১. কুরআন বুঝা সহজ
২. আমপারা (তাফহীমুল কুরআনের সার-সংক্ষেপ)
৩. ২৯ পারা (তাফহীমুল কুরআনের সার-সংক্ষেপ)

সীরাতুন্নবী

৪. সীরাতুন্নবী সংকলন
৫. নবী জীবনের আদর্শ
৬. ইসলামে নবীর মর্যাদা
৭. বিশ্ব নবীর চরিত্র গঠন পদ্ধতি
৮. বিশ্ব নবীর জীবনে রাজনীতি
৯. রাহমাতুললিল আলামীন

ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠন

১০. ইসলামী ঐক্য ইসলামী আন্দোলন
১১. ইকামাতে দ্বীন
১২. ইসলামী আন্দোলন-সাফল্য ও বিভ্রান্তি
১৩. বাইয়াতের হাকীকাত
১৪. রুকনিয়াতের দায়িত্ব ও মর্যাদা
১৫. ইসলামী আন্দোলনে কর্মীদের ৭ দফা

জামায়াতে ইসলামী

১৬. জামায়াতে ইসলামীর বৈশিষ্ট্য
১৭. জামায়াতে ইসলামী ও বাংলাদেশ
১৮. গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও জামায়াতে ইসলামী
১৯. অমুসলিম নাগরিক ও জামায়াতে ইসলামী
২০. বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ ও জামায়াতে ইসলামী

বাংলাদেশ

২১. আমার দেশ বাংলাদেশ
২২. বাংলাদেশের রাজনীতি
২৩. বাংলাদেশে আদর্শের লড়াই
২৪. পলাশী থেকে বাংলাদেশ

বিভিন্ন বিষয়

২৫. ইসলামের পুনরুজ্জীবনে মাওলানা মওদূদীর অবদান
২৬. আধুনিক পরিবেশে ইসলাম
২৭. কিশোর মনে ভাবনা জাগে
২৮. ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ
২৯. মুসলিম মা বোনদের ভাবনার বিষয়
৩০. ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার রূপ
৩১. A Guide To Islamic Movement
৩২. মনটাকে কাজ দিন
৩৩. মযবুত ঈমান
৩৪. আসুন আল্লাহর সৈনিক হই
৩৫. জীবন্ত নামায
৩৬. ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের সহীহ্ জযবা
৩৭. সৎ লোকের এত অভাব কেন
৩৮. আল্লাহর আইন ও সৎলোকের শাসন
৩৯. মুসলিম নেতাদের এ দশা কেন ?
৪০. কুরআনে ঘোষিত মুসলিম শাসকদের ৪ দফা কর্মসূচী